মাসিক
আল-আবরার
The Monthly AL-ABRAR
রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৫, সংখ্যা-১০
নভেম্বর ২০১৬ ইং, সফর ১৪৩৮ হি., কার্তিক ১৪২৩ বাং

الأبرار
مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية
صفر المظفر ١٤٣٨ﻫ، نوفمبر ٢٠١٦م

প্রতিষ্ঠাতা
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
প্রধান সম্পাদক
মুফতী আরশাদ রহমানী
সম্পাদক
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক
নির্বাহী সম্পাদক
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
সহকারী সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ
০১৯৭৮৪২৪৬৪৭, ০১১৯১৯১১২২৪

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র
প্রচার সংখ্যা : ১০,০০০ (দশ হাজার)

যোগাযোগ
সম্পাদনা দফতর
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪০২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.............................. ৩
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৩.... ৫
দরসে ফিকহ
পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৯......... ৯
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদুয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৫
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
প্রকৃত আলেম.. ১৬
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
দ্বীনের দাঈ ও খাদেমদের পরস্পর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?.. ২০
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক
মাযহাব অনুসরণ; তাৎপর্য ও বাস্তবতা ২৩
মুফতি আবুল কাসেম নোমানী
কাউকে অবজ্ঞা ও উপহাস করার পরিণতি ২৭
মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী
ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৬.......................... ৩১
মাওলানা কাসেম শরীফ
দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি,
শিক্ষানীতি ও আত্মসংশোধন পদ্ধতি.................. ৩৫
মাওলানা শাওকাত আলী কাসেমী বস্তভী
আল্লামা শায়খ শোয়াইব আরনাউত আর নেই........ ৪৫
মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৬

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭, ০১১৯১৯১১২২৪

সম্পাদকীয়

দেওবন্দিয়াতের বলিষ্ঠ তরজুমান ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)

১০ নভেম্বর ২০১৫। হতাশাঘেরা এক রজনী। এ রাতেই উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.) আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন পরপারে।

তিনি ছিলেন উম্মাহ দরদি যুগের এক মহাপুরুষ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিলীন করেছেন ইলমে নববীর আহরণ, বিস্তার, প্রচার-প্রসার এবং বাস্তবায়নে। সত্যিকারার্থে দারুল উলূম দেওবন্দের ভক্ত, বলিষ্ঠ মুখপাত্র। আকাবিরদের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাশীল।

তাঁর নীতি-আদর্শ এবং চিন্তাধারা ছিল মুসলিম উম্মাহ যেন বাতিলের সর্বপ্রকার চক্রান্তমুক্ত থাকে। ইসলামের নামে কোনো গোমরাহ-বাতিল দল বা ব্যক্তি মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে না পারে। বিশেষ করে সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও তারবীয়াতের দূর্গ কওমী মাদ্রাসাগুলো যেন যাবতীয় ফিতনামুক্ত ও স্থিতিশীল পরিবেশ পায়। ইলমে নববীর সুধা আহরণকারী তালিবে ইলমগণ যেন তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জন করতে পারে। আমলী এবং রুহানী ময়দানে তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়। এসব ফিকির বাস্তবায়নে দিনরাত সচল থাকত তাঁর অক্লান্ত মেহনত।

মাদ্রাসা জিন্দেগীতে তাঁর অমোঘ খেদমাত পুরো মুসলিম দুনিয়ার জন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত। আকাবিরদের রেখে যাওয়া নীতি-আদর্শের ওপর পরিপূর্ণভাবে অবিচল থেকে অতি অল্প পরিসরে যে বিশাল খিদমাত তিনি রেখে গেছেন সেগুলো সার্বিক বিবেচনায় সত্যিই অতুলনীয় এবং অকল্পনীয়। কারো প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার খাস রহমত ও গায়েবী মদদ না থাকলে এরূপ হয়ে ওঠে না।

আল্লাহ তা'আলার শোকর, আজ জাতীয়ভাবে দেওবন্দী আদর্শ ও দেওবন্দিয়াত বিষয়ে সাড়া জেগেছে। দেওবন্দী আদর্শ আর দেওবন্দিয়াত এতই সহজ বিষয় নয়। হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর জীবনচরিতের ওপর সামান্য নজর ফেরালেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আকাবিরদের নীতি-আদর্শ এবং দেওবন্দিয়াত অটুট রাখার জন্য হযরত ফকীহুল মিল্লাতের অবিচল পদচারণ ইতিহাসের একটি অনিবার্য অধ্যায়। হাজারো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি এই নীতি-আদর্শকে সমুন্নত রাখতে জীবন বাজি রেখে প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। যেকোনো নতুন বিষয় সামনে এলে তিনি সর্বপ্রথম বিষয়টি নিয়ে দেওবন্দের শরণাপন্ন হতেন। ফাতওয়া তাঁর জানা ছিল। এর দলিল, যুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। তথাপি নিজে এর সমাধান পেশ না করে আগে দেওবন্দের বর্তমান চিন্তাধারা যাচাই করতেন।

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) ছিলেন এ দেশের বহু কওমী মাদ্রাসার অভিভাবক, পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিটি মাদ্রাসাকে তিনি দেওবন্দের মূলনীতির ওপর পরিচালনা এবং প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে অনেক কঠোর ভূমিকা পালন করতেও দেখা যেত। এ কারণে অনেক সময় আপনদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার ক্ষোভের সৃষ্টি হতো। কিন্তু হযরত (রহ.) এ ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি হতেন না।

আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শ অনুযায়ী ছাত্রদের তা'লীমী এবং তারবীয়াতি ব্যবস্থাপনার সমন্বয় সাধনে তিনি ছিলেন কঠোর এবং অবিচল। মাদ্রাসা পরিচালনায় ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি তাঁর শফকত, দরদ, স্নেহ-মোহাববত যেমন বেনজির দৃষ্টান্ত ছিল, তেমনি নীতি-আদর্শের সংরক্ষণে তাঁর কঠোরতা এবং দৃঢ়তাও একটি বাস্তব উপমা।

একসময় ডিজিটাল ছবি, ভিডিও ইত্যাদি বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক চর্চা আরম্ভ হয়। অনেকে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে বিষয়টিতে শীথিলতা আনার চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত (রহ.) সে ব্যাপারেও সরাসরি দেওবন্দের সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দেন।

যুগ চাহিদা ও জরুরতের কথা বলে মহিলা মাদ্রাসা এবং মক্তবরাতের জামাআত চালু হয় এ দেশে। অনেক উলামায়ে কেরাম এটিকে জরুরিও মনে করে থাকেন। কিন্তু হযরত (রহ.) এ ব্যাপারেও দেওবন্দের সিদ্ধান্ত থেকে চুল পরিমাণ সরে আসতে রাজি হননি।

ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারেও তিনি দেওবন্দের পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মাওলানা মুফতী তকী উসমানী (দা.বা.)-এর গবেষণাকে কাজে লাগান। মুফতী তকী সাহেব দা.বা.ও তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখতেন। উভয়ের চিন্তাধারায় এ দেশে সর্বপ্রথম ইকিতিসাদে ইসলামীর নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কওমী মাদ্রাসার জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা দেওবন্দের মূলনীতিবিরোধী কাজ। সে কারণে হযরত (রহ.) নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে সে ধরনের কোনো কাজ করেননি। বরং তাঁর পরিচালনাধীন এক মাদ্রাসায় আগে থেকে কিছু দোকানপাট ছিল। সেগুলো বন্ধ করে ছাত্রাবাস বানানো হয়। তখন তিনি বলেছিলেন, ভাই! এই দোকানগুলো থেকে ধরে নিন বছরে দশ লক্ষ টাকা আয় হবে। আর মাদ্রাসার খরচ হলো দুই কোটি টাকা। এক কোটি নব্বই লাখা টাকা গায়েবীভাবে যে উৎস থেকে আসে, আল্লাহ তা'আলা এই দশ লাখ টাকাও সেভাবে ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, মাদ্রাসার কোনো জায়গা পরিত্যক্ত থাকলে, আপাতত মাদ্রাসার কোনো কার্যক্রম সেখানে চালানোর পরিকল্পনা না থাকলে ওই জায়গায় অস্থায়ীভাবে কিছু করা যায়, সেটা ভিন্ন কথা।

বর্তমানে কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির কথা এসেছে। তা নিয়ে উলামায়ে কেরামও বিভিন্নভাবে তৎপর। আরো কয়েক বছর আগে যখন কওমী সনদের স্বীকৃতির কথা শুরু হয় তখন হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) স্বয়ং দেওবন্দ গিয়ে মুরব্বিদের সাথে পরামর্শ করেন। এমনকি পাকিস্তানে গিয়ে আল্লামা তকী সাহেবসহ বড় বড় উলামায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময় করেন। কেউ তাঁকে সনদের স্বীকৃতির ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি বরং নেতিবাচক পরামর্শই দিয়েছেন। সে কারণে তিনি কোনো সময় সনদের স্বীকৃতি নেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তার পরও যদি বাধ্য হয়ে সনদের স্বীকৃতি নিতে হয় তখন করণীয় কী হতে পারে–সে ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে কিছু স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন তিনি। যা বর্তমানে তাঁর সংশ্লিষ্ট বোর্ড এবং মাদ্রাসাসমূহের জন্য মূলনীতি-আদর্শ হিসেবেই অটুট আছে।

তেমনি, বাতিল ফেরকা প্রতিরোধ, তা'লীমী নেসাব, মাদ্রাসা পরিচালনা পদ্ধতি, ছাত্রদের তারবীয়াতের নিয়ম, উলামায়ে কেরাম ও ছাত্রদের রাজনীতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সব বিষয়েই তিনি দেওবন্দের মূলনীতির ওপরই দৃঢ় অবিচল ছিলেন।

আজ হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) নেই, কিন্তু তাঁর ফুয়ুজ জারি আছে, যা আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করছি।

আমরা এবং আমাদের সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব সকলে যেন তাঁর নীতি-আদর্শের ওপর দৃঢ় থাকতে পারি, তাঁর ফুয়ুজাত এবং বরকত সব সময় জারি থাকে এই দু'আ কামনায়...।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৮/১০/২০১৬ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ্ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারো। (সূরা আলে ইমরান ১০৩)

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে জগতের জাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল-নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে দ্বিমতের কোনোই অবকাশ নেই। সম্ভবত জগতের কোথাও এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর দলের ভেতরে উপদল এবং সংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কল্পকাহিনীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্য একটি ন্যায়ানুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে, যা স্বীকার করে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই যে কোনো মানুষের মস্তিষ্কনিঃসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে–এটা বিবেক ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক; এ কথা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটিমাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কী এবং কোনটি? ইহুদিরা তাওরাতের ব্যবস্থাকে এবং খ্রিস্টানরা ইঞ্জিলের ব্যবস্থাকে আল্লাহপ্রদত্ত অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবি করে। এমনকি মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব-স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান বলেই দাবি করে থাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কোরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে এ কোরআনী মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতধাবিভক্ত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর অমোঘ ব্যবস্থাই وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا (আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো।) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে 'আল্লাহর রজ্জু' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের রেওয়ায়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض অর্থাৎ, কোরআন হলো আল্লাহ তা'আলার রজ্জু, যা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত। (ইবনে কাসীর)

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে حبل الله هو القران অর্থাৎ 'আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কোরআন।' (ইবনে কাসীর)

আরবী বাচন পদ্ধতিতে 'হাবল'-এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যেকোনো বস্তুকেই বলা হয়, যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কোরআন অথবা দ্বীনকে 'রজ্জু' বলার কারণ এই যে এটা একদিকে আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশ্ববাসী মানুষের সম্পর্ক কায়েম করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

মোটকথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতিই বিবৃত হয়েছে। কেননা প্রথমত, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত জীবনব্যবস্থা কোরআনকে কাজেকর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, সব মুসলমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণত, একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যাবে।

এ ছাড়া আয়াতে একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে যে মুসলমানরা যখন আল্লাহর গ্রন্থকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে ওই ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোনো

উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সবাই মিলে কোরআনকে শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোনো অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের মতো মুসলিম জাতির শক্তিও সুদৃঢ় ও অজেয় হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্রিত হয় এবং মরণোন্মুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোরআন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না।

ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব :

ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্ককে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণত, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোরাইশকে এক জাতি ও বানু-তামীমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দিরা একজাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম-প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্ন জাতি। উদাহরণত,
ভারতের হিন্দু ও আর্জ সমাজের কথা বলা যায়।

কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু 'হাবলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত মজবুত জীবনব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি–যারা আল্লাহর রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাফেররা ভিন্ন জাতি–যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদিগকে দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত জীবনব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়ত, একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ করো, যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলার পর বলা হয়েছে : وَّلَاتَفَرَّقُوْا পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। কোরআন পাকের বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি এই যে যেখানে ধনাত্মক দিক ফুটিয়ে তোলা হয়, সেখানেই ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করে উপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া থেকে বারণ করা হয়।

এ ছাড়া কোরআন বিভিন্ন পয়গম্বরের উম্মতদের ঘটনাবলি বর্ণনা করে দেখিয়েছে যে তারা কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এবং তিনটি অপছন্দ করেছেন।

পছন্দনীয় জিনিসগুলো হলো :

এক. তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। দুই. আল্লাহর কিতাব কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে এবং তিন. শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে।

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো হলো :

এক. অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান। দুই. বিনা প্রয়োজনে কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়া এবং তিন. সম্পদ বিনষ্ট করা। (ইবনে কাসীর)

এখন প্রশ্ন এই যে প্রত্যেক মতভেদই কি নিন্দনীয় এবং মতভেদের কোনো দিকই কি অনিন্দনীয় নেই? উত্তর এই যে প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদ প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নিন্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও মেধার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং ফিকাহবিদ আলেমগণের মধ্যকার মতভেদ ছিল এমনি ধরনের। এমন মতভেদকে রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কেই দ্বীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাও নিন্দনীয়।

পারস্পরিক ঐক্যের উভয় দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ওই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম পূর্বকালে আরবরা লিপ্ত ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ খুনখারাবি ইত্যাদির কারণে গোটা আরব জাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামরূপ আল্লাহ বিশেষ রহমতই তাদের এমন অশান্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে।

মুসলমানদের ঐক্য আল্লাহর আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল :

কোরআন পাকের এ উক্তি থেকে আরো একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে অন্তরের মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা। সম্প্রীতি বা ঘৃণা সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ। কোনো দলের অন্তরে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহের দান। আর এ কথা সবারই জানা যে আল্লাহর অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অবাধ্যতা ও গোনাহ দ্বারা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূরপরাহত।

এর ফলশ্রুতি এই যে মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও ঐক্য কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেওয়া। এদিকে ইশারা করার জন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বিশুদ্ধ পথে থাকো।

কোরআন মজীদের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-২৩

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখানে ফাজায়েলে যিকিরে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে যিকির তৃতীয় অধ্যায় :

হাদীস নং-১৯

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِى عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِى عُمَرَ -قَالُوا :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِىَ فِى مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِىَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ :مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِى فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ :نَعَمْ، قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের নামাযের সময় তাঁর নিকট হতে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন। আর তিনি আপন জায়নামাযে বসে (তাসবীহ পড়তে ছিলেন) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি) চাশতের নামাযের পর ফিরে এলেন। তিনি তখনও একই অবস্থায় বসে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সেই অবস্থায়ই আছো? যে অবস্থায় আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। তিনি আরজ করলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, আমি তোমার নিকট হতে যাওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পড়েছি। যদি তা তুমি সকাল হতে এই পর্যন্ত যা কিছু পড়েছ সব কিছুর মোকাবেলায় ওজন করা হয় তবে উহা ভারী হয়ে যাবে। সেই চারটি কালেমা এই–

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর সৃষ্ট মাখলুকের সংখ্যা পরিমাণ এবং তাঁর সন্তুষ্টির সমপরিমাণ এবং তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ, তাঁর কালেমাসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।

(মুসলিম শরীফ ৪/২৯০ হা. ২৭২৬, নাসাঈ শরীফ ৩/৭৭ হা. ১২৫২, তিরমিযী শরীফ ৫/৫১৯ হা. ৩৫৫৫, ইবনে মাজাহ শরীফ ৪/২৫২ হা. ৩৮০৮, মেশকাত শরীফ ২/৭১২ হা. ২৩০১)

হাদীসটির মান : সহীহ

এই হাদীসের সাথে উল্লিখিত আরেকটি হাদীস :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِى هِلَالٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى، أَوْ حَصًى تسبح به فقال على أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا وَأَفْضَلُ؟ :سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَاحول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ

হযরত সাআদ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাথে একজন সাহাবিয়ার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর সম্মুখে খেজুরের বীচি অথবা কংকর রাখা ছিল। তা দ্বারা তিনি তাসবীহ পড়তেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বলে দেব কি, যা এটি হতে সহজ অর্থাৎ কংকর দ্বারা গণনা করা হতে সহজ হয়; অথবা এরূপ বলেছেন, এটি হতে উত্তম। তা হলো–

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْأَرْضِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَاحول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِك

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, আসমানে সৃষ্ট তাঁর মাখলুকের সমপরিমাণ, জমিনে সৃষ্ট তাঁর মাখলুকের সমপরিমাণ, এই দুইয়ের মাঝখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানে সৃষ্ট মাখলুকের সমপরিমাণ। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি ওই সব কিছুর সমপরিমাণ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর ওই সব কিছুর সমপরিমাণ আল্লাহু আকবার ওই সব কিছুর সমপরিমাণ আল-হামদু লিল্লাহ এবং ওই সব কিছুর সমপরিমাণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ওই সব কিছুর সমপরিমাণ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ।

(আবুদাউদ শরীফ ২/১৬৯ হা. ১৫০০, নাসাঈ শরীফ [কুবরা] ৯/৭৩ হা. ৯৯২২, তিরমিযী শরীফ ৫/৫২৫ হা. ৩৫৬৮, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৫৪৮ হা. ২০০৯, সহীহে ইবনে হিব্বান ৩/১১৮ হা. ৮৩৭, মেশকাত শরীফ ২/৭১৫ হা. ২৩১১)

হাদীসটির মান : সহীহ

তৎসংশ্লিষ্ট আরেকটি হাদীস

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ، ثنا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ، ثنا هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ كِنَانَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَىَ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهِنَّ، فَقَالَ :يَا بِنْتَ حُيَيٍّ مَا هَذَا؟ قُلْتُ :أُسَبِّحُ بِهِنَّ، قَالَ :قَدْ سَبَّحْتُ مُنْذُ قُمْتُ عَلَى رَأْسِكِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا قُلْتُ :عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : قُولِى سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَىْءٍ .

(তিরমিযী শরীফ ৫/৫১৯ হা. ৩৫৫৪, মুসতাদরাকে হাকেম ১/৭৩২ হা. ২০০৫, আল কামেল [ইবনে আদী] ৭/১১৫ হা. ২০৩২)

হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

হযরত আলী (রা.) হতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, তাসবীহ কতই না উত্তম মুজাককিরা বা স্মারক।

نعم المذكر السبحة، وإن أفضل ما يسجد عليه الأرض، وما أنبتته الأرض ."

أخرجه الديلمى فى "مسند الفردوس (٤/٩٨ مختصره) قال :أنا عبدوس بن عبد الله أنا أبو عبد الله الحسين بن فنجويه الثقفى، حدثنا على بن محمد بن نصرويه، حدثنا محمد بن هارون بن عيسى بن منصور الهاشمى حدثنى محمد بن على بن حمزة العلوى حدثنى عبد الصمد بن موسى حدثتنى زينب بنت سليمان بن على حدثتنى أم الحسن بنت جعفر بن الحسن عن أبيها عن جدها عن على مرفوعا، ذكره السيوطى فى رسالته " :المنحة فى السبحة " (١٤١/٢ من الحاوى) ونقله عنه الشوكانى فى "نيل الأو طار ١٦٦/٢–١٦٧)-

(মুসনাদে দায়লামী 8/২৫৯ হা. ৬৭৬৫, কানযুল উম্মাল ৭/১৫৩১ হা. ২০১০৯)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-২০ :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِى الْجُرَيْرِىَّ، عَنْ أَبِى الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ، قَالَ :قَالَ لِى عَلِيٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّى، وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ :بَلَى، قَالَ :إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِى يَدِهَا، وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَ فِى نَحْرِهَا، وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا، فَأَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَمٌ، فَقُلْتُ :لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا، فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ، فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ :مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟ فَسَكَتَتْ، فَقُلْتُ :أَنَا أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِى يَدِهَا، وَحَمَلَتْ بِالْقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِى نَحْرِهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ الْخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ فَتَسْتَخْدِمَكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّ مَا هِىَ فِيهِ، قَالَ :اتَّقِى اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ، وَأَدِّى فَرِيضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمَلِى عَمَلَ أَهْلِكِ، فَإِذَا

أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِى ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَاحْمَدِى ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبِّرِى أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ مِائَةٌ، فَهِىَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ قَالَتْ :رَضِيتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وفى الباب عنه: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِىُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّمْرِىِّ، أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ، أَوْ ضُبَاعَةَ ابْنَتَىِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، حَدَّثَتْهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا، أَنَّهَا قَالَتْ :أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيًا، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِى، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ السَّبْىِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ، لَكِنْ سَأَدُلُّكُنَّ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِكَ :تُكَبِّرْنَ اللَّهَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَكْبِيرَةً، وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

হযরত আলী (রা.) তাঁর এক শাগরেদকে বললেন, আমি তোমাকে আমার এবং আমার স্ত্রী, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘটনা শুনাব কি? তিনি আরজ করলেন–অবশ্যই, শোনান। হযরত আলী (রা.) বললেন, হযরত ফাতেমা (রা.) নিজ হাতে জাঁতা চালাতেন। যদ্দরুন হাতে গিঁট পড়ে গিয়েছিল। নিজেই মশক ভরে পানি বহন করে আনতেন। যদ্দরুন বুকের ওপর রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। ফলে কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে থাকত। একবার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী এসেছিল। আমি হযরত ফাতেমা (রা.) কে বললাম, পিতার নিকট হতে যদি একজন খাদেম চেয়ে আনতে তবে ভালো হতো এবং তোমার কষ্ট কিছুটা লাঘব হতো। তিনি গেলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে, লোকজন ভর্তি ছিল দেখে ফিরে এলেন। পরদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, তুমি কাল কী জন্য গিয়েছিলে? হযরত ফাতেমা (রা.) চুপ করে থাকলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাঁতা পিষার কারণে তার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছে, পানিভর্তি মশক বহন করে আনার কারণে বুকের ওপর রশির দাগ পড়ে গিয়েছে। ঝাড়ু দেওয়ার কারণে কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে থাকে। গতকাল আপনার নিকট কিছু গোলাম ও বাঁদী এসেছিল। সে জন্য আমি নিজে তাঁকে বলেছিলাম একজন খাদেম চেয়ে আনার জন্য। যাতে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ কররেন, হে ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। তোমার ফরয আদায় করতে থাকো। আর ঘরের কাজকর্ম করতে থাকো। আর যখন ঘুমানোর জন্য শয়ন করো তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও। এটি খাদেম হতে উত্তম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার তাকদীর এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফায়সালার ওপর সন্তুষ্ট আছি।

আরেক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুফাতো বোনদের ঘটনাও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বললেন, আমরা দুই বোন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কন্যা ফাতেমা (রা.)সহ তিনজন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং নিজেদের কষ্ট ও অসুবিধার কথা উল্লেখ করে একজন খাদেম চাইলাম। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, বদর যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছে তাঁদের এতিম সন্তানরা খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশি হক্ব রাখে। আমি তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়েও উত্তম জিনিস বলে দিতেছি–তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এই তিনটি কালেমা ৩৩ বার করে পড়ো আর একবার এই কালেমা পড়ে নাও। এটি খাদেম হতে উত্তম।

وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٍ

(১. বুখারী শরীফ ৭/১৯৪ হা. ৬৩১৮, মুসলিম শরীফ ৪/২৯১ হা. ২৭২৭, আবু দাউদ শরীফ ৩/৩৯৪ হা. ২৯৮৮)
হাদীসটির মান : সহীহ।
(২. আবু দাউদ শরীফ ৩/৩৯৩ হা. ২৯৮৭, তিরমিযী শরীফ ২/২৬৪ হা. ৪১০, মুআত্তা মালেক ১/২১০ হা. ২২)
হাদীসটির মান : সহীহ

ক.

এক হাদীসে আছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের বিবিদের শোবার সময় সুবহানাল্লাহ, আলাহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ৩৩ বার করে পড়তে বলতেন।

وكان صلى الله عليه وسلم يأمر نساء ه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد الله ثلاثاً وثلاثين وتسبح ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين، ويدعو دعاء النوم وينام.

(জামেউস সগীর ৩/১৪০৭ হা. ৬৯৪৫, কানযুল উম্মাল ৭/১৭৭ হা. ১৮২৫৭)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

খ.

এক হাদীসে আছে, দাজ্জালের যামানায় ফেরেশতাদের খাদ্যই মুমিনদের খাদ্য হবে। যে ব্যক্তি মুখে এই কালেমাগুলো পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষুধার কষ্ট দূর করে দেবেন।

أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ طَعَامِ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ الدَّجَّالِ، قَالَ :طَعَامُ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا :وَمَا طَعَامُ الْمَلَائِكَةِ؟ قَالَ :طَعَامُهُمْ مَنْطِقُهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، فَمَنْ كَانَ مَنْطِقُهُ يَوْمَئِذٍ التَّسْبِيحَ وَالتَّقْدِيسَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْجُوعَ، فَلَمْ يَخْشَ جُوعًا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ "

(মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫১১ হা. ৮৫৬১, ইবনে মাজাহ শরীফ ৪/৪০৮ হা. ৪০৭৭)

হাদীসটি নির্ভরযোগ্য।

গ.

এক হাদীসে আছে, যদি কোথাও আগুন লেগে যায় তবে বেশি বেশি আল্লাহু আকবার পড়তে থাকো। এটি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُطْفِيهِ

(কামেল লিইবনে আদী ৪/১৫১, আমালুল ইয়ওমি ওয়াল লাইলা [ইবনে সুন্নী] ১০৭, আলকুনা ওয়াল আসমা লিদ্দুলাবী ৩/১০৮৮, আদ্দুআ [তাবরানী] ১/৩০৭)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ঘ.

এক হাদীসে আছে, দুটি আমল এমন আছে, যে ব্যক্তি উহার ওপর আমল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমল দুটি খুবই সহজ কিন্তু এর ওপর আমলকারী খুবই কম। একটি হলো এই তাসবীহগুলোকে প্রত্যেক নামাযের পর দশ-দশবার করে পড়বে। পড়ার মধ্যে তো ১৫০ কিন্তু আমলের পাল্লায় ১৫০০ হবে। দ্বিতীয়টি হলো, শোয়ার সময় সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়বে। পড়ার মধ্যে তো ১০০ হয় কিন্তু সাওয়াবের দিক হতে ১০০০ হবে। কেউ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ তা কী কারণে যে এর আমলকারী অনেক কম হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, নামাযের সময় শয়তান এসে বলতে থাকে তোমার অমুক কাজ আছে, অমুক প্রয়োজন রয়ে গেছে। অনুরূপ শোয়ার সময়ও সে বিভিন্ন প্রয়োজনের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে তাসবীহ পড়া বাদ পড়ে যায়।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :خَصْلَتَانِ، أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؟ قَالَ :يَأْتِي أَحَدَكُمْ -يَعْنِي الشَّيْطَانَ -فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ، وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا

(আবু দাউদ শরীফ ৫/৩০৯ হা. ৫৬৫, নাসাঈ শরীফ ৩/৭৩ হা. ১৩৪৭, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/৩৬১ হা. ২০১৮ তিরমিযী শরীফ ৫/৪৪৫ হা. ৩৪১০, ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৪৯৭ হা. ৯২৬)

হাদীসটির মান : সহীহ

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

পোশাক-পরিচ্ছদ : আহকাম ও মাসায়েল-৯

মুফতী শাহেদ রহমানী

ইসলামী শরীয়তে টুপির বিধিবিধান

টুপি শব্দটির বাংলা অর্থ হলো মস্তকাবরণ বিশেষ, শিরস্ত্রাণ। এটি মূলত সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। টুপির বহুল পরিচিত আরবী 'কালানসুওয়া'। এটি 'কালসুন' থেকে উদ্গত, এর বহুবচন হলো 'কালানিস'। 'কালানসুওয়া' অর্থ শিরোভূষণ। বর্তমানে আরবরা টুপিকে 'তাগিয়া' (তাকিয়া) বলে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা টুপি পরিধান করতেন। নামাযের সময় টুপি পরা বা মাথা ঢেকে রাখা সুন্নাত। এস্তেঞ্জার সময়ও মাথা ঢেকে রাখা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিন বা ততোধিক টুপি ছিল। এগুলোর রং ও ডিজাইন বিভিন্ন ধরনের ছিল। যেমন–সাদা, কালো, গোল, লম্বা, উঁচু, কানওয়ালা ইত্যাদি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাগড়ি ছাড়াও টুপি পরতেন, কিন্তু টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন না।

টুপি মুসলিম উম্মাহর জাতীয় নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদগণসহ সব যুগে টুপি পরিধান করার প্রচলন মুসলিম সমাজে ছিল, এখনো আছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) টুপিকে মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্যকারী নির্ধারণ করেছেন। কাফেররা পাগড়ি পরিধান করে, কিন্তু টুপি পরিধান করে না। তাই তিনি মুসলমানদের পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করে বিধর্মীদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিতেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খোলা মাথায় কখনো নামায আদায় করেছেন বলে কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে ইদানীং কিছু মুসলমান টুপির ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন, এমনকি একে অবজ্ঞা করারও দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর টুপি

হযরত হাফিয আবু শাইখ ইসফাহানী (রহ.) তাঁর 'আখলাকুন নবী' গ্রন্থে 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর টুপির বর্ণনা' নামক আলাদা অধ্যায় সংযোজন করেছেন। সেখানে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদা টুপি পরিধান করতেন। (তাবরানী ক্বাবীর : ১৩/২০৪; আল-জামিউস সগীর, হাদীস : ১০০৯২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ شَامِيَّةٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শামে (সিরিয়ার) তৈরি সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।'

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ فِي السَّفَرِ ذَوَاتِ الْآذَانِ، وَفِي الْحَضَرِ الْمُشَمَّرَةَ، يَعْنِي الشَّامِيَّةَ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'সফরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন টুপি পরিধান করতেন, যা দ্বারা কান ঢাকা যায় এবং বাড়িতে অবস্থানকালে শামে তৈরি (সাধারণ) টুপি পরিধান করতেন।' (আল জামে লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে : পৃষ্ঠা-২০২; তারীখে দামেশক লিইবনিল আসাকির : ৪/১৯৩; আল-জামিউস সগীর, হাদীস : ১০০৯৩)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ قَلَانِسَ: قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مُضَرَّبَةٌ، وَقَلَنْسُوَةُ بُرْدٍ حِبَرَةٌ، وَقَلَنْسُوَةٌ ذَاتُ آذَانٍ، يَلْبَسُهَا فِي السَّفَرِ، وَرُبَّمَا وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিন ধরনের টুপি ছিল। সাদা তুলার আস্তরণবিশিষ্ট টুপি, ডোরাদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা নির্মিত টুপি এবং কান ঢাকা যায়, এমন টুপি। এটি তিনি সফরকালে পরতেন এবং কখনো কখনো নামায আদায়ের সময় সেটি সামনে রেখে দিতেন। (আখলাকুন নবী : ২/২১১-৩১৫)

عن رجل من الصحابة، قال :أكلت مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه وآله وسلم، ورأيت عليه قلنسوة بيضاء فى

فى رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال :قلت :غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبى :نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا فى صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا، فقال :حدثتنى أم قيس بنت محصن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم، اتخذ عمودا فى مصلاه يعتمد عليه

হেলাল ইবনে ইয়াসাফ বলেন, আমি রাক্কায় (সিরিয়ার একটি এলাকা) গিয়েছিলাম। তখন আমার এক সঙ্গী আমাকে বলল, 'তুমি কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবীর কাছে যেতে চাও?' আমি বললাম, 'এ তো গনীমত (সৌভাগ্য)।' তারপর আমরা ওয়াবিছা (রা.)-এর কাছে গেলাম। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, দাঁড়াও, প্রথমে আমরা তাঁর আচার-আচরণ দেখব। তাঁর মাথায় দুই কানবিশিষ্ট টুপি ছিল, যা মাথার সঙ্গে মিশে ছিল। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৯৪৮)

عَنْ هِشَامٍ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ قَلَنْسُوَةً لَهَا رُبٌّ، كَانَ يَسْتَظِلُّ بِهَا إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ

হিশাম বলেন, আমি ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর মাথায় টুপি দেখেছি। টুপির বর্ধিত অংশ ছিল। কা'বাগৃহে তাওয়াফ করার সময় তিনি সেই অংশ দিয়ে ছায়া গ্রহণ করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

আশআছ (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, 'আবু মুসা আশআরী (রা.) হাম্মাম থেকে বের হলেন। তাঁর মাথায় টুপি ছিল।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ২৪৮৫৯)

حدثنا عباد بن أبى سليمان قال :رأيت على أنس بن مالك قلنسوة بيضاء .

আব্বাদ ইবনে আবী সুলাইমান বলেন, وسط رأسه.

হাসান বিন মেহরান থেকে বর্ণিত, একজন সাহাবী বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে তাঁর দস্তরখানে খেয়েছি। আমি তাঁর মাথায় সাদা টুপি দেখেছি। (আল ইসাবাহ : ৪/৩৩৯)

عمر بن الخطاب قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ": الشهداء أربعة :رجل مؤمن جيد الإيمان، لقى العدو، فصدق الله حتى قتل، فذلك الذى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا "ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته، قال :فما أدرى أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبى صلى الله عليه وسلم؟

উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, 'শহীদ হলো চার ধরনের লোক। এমন মুমীন, যে তার বিশ্বাসে স্থির ও দৃঢ়। শত্রুদের মোকাবিলায় যে শহীদ হয়, এমন অবস্থায় যে সে আল্লাহ রাববুল আলামীনের ওপর পূর্ণ আস্থাবান ও বিশ্বাসী। কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা এত উচ্চ হবে যে মানুষ তার দিকে এভাবে তাকাবে। এ কথা বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মাথা তুললেন। তখন তাঁর টুপি পড়ে গেল। অথবা বলেছেন উমরের টুপি পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, কার টুপির কথা বলা হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর, না উমর (রা.)-এর।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬, জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৬৪৪)

সাহাবায়ে কেরামের টুপি

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁরা তা-ই করতেন, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করতেন কিংবা করতে বলতেন। চলাফেরা, আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। হাদীস ও আছারের কিতাবে সাহাবায়ে কেরামের টুপি পরিধানের অসংখ্য প্রমাণ আছে। এখানে কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত হলো–

وقال الحسن :كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه فى كمه

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, লোকেরা [(সাহাবায়ে কেরাম) গরমের দিনে] পাগড়ি ও টুপির ওপর সিজদা করতেন। [সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, 'প্রচণ্ড গরমের কারণে কাপড়ের ওপর সিজদা করা' অধ্যায়]

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত 'লোকেরা' শব্দ দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। (ফতহুল বারী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৮৮)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ": أَدْرَكْتُ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ يَعْتَمُّونَ بِعَمَائِمَ كَرَابِيسَ سُودٍ، وَبِيضٍ، وَحُمُرٍ، وَخُضْرٍ، وَصُفْرٍ، يَضَعُ أَحَدُهُمَا الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَضَعُ الْقَلَنْسُوَةَ فَوْقَهَا، ثُمَّ يُدِيرُ الْعِمَامَةَ هَكَذَا ,يَعْنِى :عَلَى كَوْرِهِ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ تَحْتِ ذَقَنِهِ "

সুলাইমান ইবনে আবি আবদিল্লাহ বলেন, 'আমি প্রথমসারির মুহাজিরদের দেখেছি, তাঁরা সুতির পাগড়ি পরিধান করতেন, কালো, সাদা, লাল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি রঙের। তাঁরা পাগড়ির কাপড় মাথায় রেখে তার ওপর টুপি রাখতেন। তারপর তার ওপর পাগড়ি ঘুরিয়ে পরতেন।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা : ১২/৫৪৫)

عن هلال بن يساف، قال :قدمت الرقة، فقال لى بعض أصحابى :هل لك

‘আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর মাথায় একটি সাদা টুপি দেখেছি।’ (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৫/১২১)

عن أبى حيان قال :كانت قلنسوة على لطيفة.

আবু হাইয়ান বলেন, ‘আলী (রা.)-এর টুপি ছিল পাতলা।’ (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৩/২৩)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) মাথা মাসেহর সময় টুপি উঠিয়ে নিতেন এবং অগ্রভাগ মাসেহ করতেন। (সুনানে দারে কুতনী, হাদীস : ৫৫; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস : ২৮৮)

ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ فَقَدَ قَلَنْسُوَةً لَهُ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَقَالَ :اطْلُبُوهَا فَلَمْ يَجِدُوهَا فَقَالَ :اطْلُبُوهَا فَوَجَدُوهَا فَإِذَا هِيَ قَلَنْسُوَةٌ خَلَقَةٌ فَقَالَ خَالِدٌ " :اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ قَالَ : فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ فَجَعَلْتُهَا فِي هَذِهِ الْقَلَنْسُوَةِ فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِي إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ

আবদুল হামিদ বিন জাফর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন তাঁর একটি টুপি হারিয়ে ফেললেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তা পাওয়া গেল। এটি ছিল একটি পুরনো টুপি। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উমরার পর মাথা মুণ্ডন করলেন। সাহাবীরা তাঁর চুল মোবারক নেওয়ার জন্য ছুটতে লাগলেন। আমি গিয়ে তাঁর মাথার অগ্রভাগের চুলগুলো পেলাম। তা এ টুপিতে সেলাই করে লাগিয়ে রেখেছি। যে যুদ্ধেই এ টুপি আমার সঙ্গে ছিল, তাতেই আল্লাহর সাহায্য পেয়েছি। (দালাইলুন নুবুওয়্যাহ : ৬/২৪৯; ত্বরানী ক্বীর, হাদীস : ৩৮০৪)

আবু ইসহাক আজরব (রহ.) থেকে বর্ণিত, ‘আমি আবু দারদা (রা.)-কে সাদা তুলার আস্তরণবিশিষ্ট ছোট টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।’ (মুসতাদরকে হাকেম, হাদীস : ৫৪৫০)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে টুপি পরিধানের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

তাবেয়ীগণের টুপি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের পাশাপাশি তাবেয়ীদের মধ্যে টুপির ব্যাপক প্রচলন ছিল। এর কিছু উদাহরণ হলো–

১. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) বলেন, ‘আমি আলী ইবনে হুসাইন (হযরত যাইনুল আবেদীন রা.)-এর মাথায় একটি সাদা মিসরি টুপি দেখেছি।’ (ইবনে আবী শায়বা, হাদীস : ২৪৮৫৫)

২. আবুল গুছন (রহ.) বলেন, ‘আমি নাফে ইবনে জুবাইরকে পুঁতিবিশিষ্ট টুপি ও সাদা পাগড়ি পরতে দেখেছি।’ (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৫/২০৬)

৩. খালেদ ইবনে বকর বলেন, ‘আমি সালেম (রহ.)-এর মাথায় সাদা টুপি দেখেছি।’ (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৫/১৯৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/৪৬৪)

৪. আইয়ুব (রহ.) বলেন, ‘আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মাথায় পশমের টুপি দেখেছি।’ (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৫/১৮৯; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/১৮৫)

৫. মুহাম্মাদ ইবনে হিলাল বলেন, ‘আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.)-কে একটি পাতলা টুপির ওপর পাগড়ি বাঁধতে দেখেছি।’ (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৫/১৩৮; সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪/২৪২)

৬. ইয়াযিদ ইবনে আবী যিয়াদ (রহ.) বলেন, ‘আমি ইব্রাহীম নখয়ী (রহ.)-এর মাথায় চামড়ার টুপি দেখেছি।’ (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৬/২৮০)

৭. হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রহ.)-এর শাহাদাতের ঘটনায় আছে, যখন হাজ্জাজ জল্লাদকে বলল, তার গর্দান উড়িয়ে দাও, তখন সে তা করল। সাঈদ ইবনে যুবাইর (রহ.)-এর মস্তক একদিকে ছিটকে পড়ল। তখন তার মাথার সঙ্গে একটি সাদা টুপি মিলিত ছিল। (তাবাকাতে ইবনে সাদ : ৫৬/২৬৫)

তাবেয়ীগণের মাত্র সাতজনের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া আরো বহু তাবেঈ থেকে টুপি পরিধানের প্রমাণ আছে।

মুজতাহিদ ইমামদের টুপি

মুজতাহিদ ইমামরা হলেন কোরআন-সুন্নাহর ভাষ্যকার। তাঁরা সবাই টুপি পরিধান করতেন।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) উঁচু টুপি পরতেন। (আল ইনতিকা, পৃষ্ঠা-৩২৬; উকদুয যামান, পৃষ্ঠা-৩০০-৩০১)

ইমাম মালেক (রহ.) যখন হাদীস বর্ণনার জন্য বের হতেন, তখন ওজু করতেন, টুপি পরতেন ও দাঁড়ি আচড়ে নিতেন। (আল জামে’, খতীব বাগদাদী : ১/১৩৮)

ফযল ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি ইমাম আহমদকে টুপির ওপর পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তবে কখনো কখনো তিনি পাগড়ি ছাড়া টুপি পরেছেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২২২)

নামাযে টুপি পরিধানের বিধান

টুপি মুসলিম উম্মাহর ‘শিআর’ বা জাতীয় নিদর্শন। টুপি নবী করীম (সা.) নিজে পরেছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন তাবেতাবেঈন ও পরবর্তী

সময়ে সব যুগে মুসলিমগণের টুপি পরিধানের ব্যাপক আমলের ধারাবাহিকতা চলে আসছে। টুপি পরিধান করা কেবল নামাযের সুন্নাত নয়, বরং সর্বাবস্থায় টুপি পরিধান করা মহানবী (সা.) থেকে প্রমাণিত।

তাই নামাযেও এই পোশাক পরিধান করা সুন্নাত। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা নামাযের সময় তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করো।' (সূরা : আ'রাফ, আয়াত : ৩১) তাফসিরে রূহুল মা'আনীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে : হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) নামাযের সময় সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন, একদিন কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন, তাই আমি আমার প্রভুর জন্য সুন্দর পোশাক পরিধান করি। (রূহুল মা'আনি : ৪/৩৪৯)।

বুখারী শরিফে হযরত হাসান বসরী (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) গরমের দিনে নামাযে পাগড়ি বা টুপির ওপর সিজদা করতেন। (সহীহ বুখারী : ১/৮৬)

হযরত যুহাইর (রহ.) বলেন, আমি প্রখ্যাত তাবেঈ আবু ইসহাক আসসাবীয়ীকে দেখেছি, তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়ছেন। তিনি মাটি থেকে টুপি উঠিয়ে মাথায় পরছেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৬/৩১৪) ইমাম মালেক (রহ.) সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। (আলজামে', খতিব বাগদাদী : ১/৩৮৮)

তাই ফুকাহায়ে কেরাম নামাযে টুপি পরিধান করা সুন্নাত বলেছেন এবং অবহেলা করে টুপি পরিধান না করে নামায পড়াকে মাকরূহ বলেছেন। স্মরণ রাখতে হবে যে টুপি ছাড়া নামায আদায় করলে তা মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও নামায আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া ক্বাযীখান : ১/১৩৫, রদ্দুল মুহতার : ১/৬৪০, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ১/৫৬৫)

নামায পড়া অবস্থায় টুপি মাথা থেকে পড়ে গেলে তা আবার মাথায় উঠিয়ে নেওয়া উত্তম। (রদ্দুল মুহতার : ১/৬৪০)। তবে নিয়ম হলো, টুপি মাথায় উঠাতে এক হাত ব্যবহার করবে, তাহলে নামাযে কোনো সমস্যা হবে না, কিন্তু টুপি উঠাতে দুই হাত ব্যবহার করলে আমলে কাছির হয়ে যাওয়ায় নামায ভেঙে যাবে। (রদ্দুল মুহতার : ১/৫৮৪, আহসানুল ফাতওয়া : ৩/৪২০)

হানাফী মাযহাব মতে, কোনো ব্যক্তি তার সর্বোত্তম তিনটি পোশাক পরিধান করে নামায পড়া মুস্তাহাব। পোশাক তিনটি হলো–কামীছ বা জামা, সালোয়ার ও পাগড়ি অথবা টুপি।

নামাযের মাকরূহ আমলগুলো হলো : ই'তিযার করা অর্থাৎ মাথার চারপাশে কাপড় পেঁচানো আর মধ্যভাগ খোলা রেখে দেওয়া। কিংবা, আলস্যবশত মাথা খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ। (আল জাযায়রী, আল ফিকহ আলা আল মাযাহিবিল আরবাআ, কিতাবুস সালাত, পৃষ্ঠা-২৮০-৮২)

হযরত বড়পীর শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (র.) বলেন, 'আগের যুগের সভ্য ও পুণ্যবান লোকদের অভ্যাস বা পদ্ধতি ছিল তাঁরা তাঁদের মাথা ঢেকে রাখতেন।' (গুনিয়াতুত তালিবীন : ১/১৪)

ইবনুল কায়্যিম জাওযী বলেন, 'মানুষের সামনে মাথা খোলা রাখা নিন্দনীয় আচরণ। এটি ভদ্রতা, মানবিকতা ও উত্তম আচরণের বিপরীত।' (ফতোয়ায়ে রহীমিয়া : ৩/২০২, ৩০৮)

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর 'আল কাউলুল মুবীন ফী আখতা আল মুসাল্লীন' গ্রন্থে বলেন, 'খোলা মাথায় নামায আদায় করা মাকরূহ।' (২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৫৮)

তিনি আরো বলেন, 'সবাই এটা মানবেন যে মুসলমানদের জন্য মুস্তাহাব হলো, নামাযে সবচেয়ে সুন্দর ও পরিপূর্ণ ইসলামী সাজসজ্জায় দাঁড়ানো। আগের মুসলমানরা তথা সলফে সালেহীনের সুন্দরতম পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে এটা ছিল না যে তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে মাথা খালি রাখতেন, খোলা মাথায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন এবং মাথা খালি অবস্থায় ইবাদতের স্থান তথা মসজিদে প্রবেশ করতেন। বরং এটি একটি বিদেশি প্রথা, যা বহুযুগ পরে কিছু মুসলমান রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করেছে, যখন বিধর্মীরা এসব দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছিল। তারপর মুসলমানরা বিধর্মীদের অনুকরণ করা শুরু করে এবং অন্য অনেক অনাচারের মতো এ বিদেশি সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে জায়গা করে নেয়। . . . এবং রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইহরামের অবস্থা ছাড়া কখনো খোলা মাথায় নামায আদায় করেছেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য অভিমত পাওয়া যায় না। সুতরাং কেউ যদি এ ধরনের দাবি উপস্থাপন করে, তবে তাকে প্রমাণ আনতে বলুন। কেননা কেবল সত্যই অনুসরণের যোগ্যতা রাখে। (আলবানী, আদ্দীনুল খালিস : ৩/২১৪; আল আজওয়ীবা আন নাফিয়া আনিল মাসায়িলিল ওয়াকিয়া, পৃষ্ঠা-১১০)

পাঁচ কল্লি টুপিই কি সুন্নাত?

হাদীস ও আছারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন ধরনের টুপি পরিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর আলোকে জানা যায়, নির্দিষ্ট কোনো ধরনের টুপি পরিধানকে সুন্নাত বলা উচিত নয়। ইসলামী শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি অনুসারে যে টুপি হবে, তা

সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে। তাই কেবল পাঁচ কল্লি টুপিকে সুন্নাত বলার সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, বিশ্রুত আছে আকাবেরে দেওবন্দের মধ্যে হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) পাঁচ কল্লি টুপি ব্যবহার করতেন, বিধায় অনেকে এ-জাতীয় টুপি পরিধান করে থাকে। এ ধরনের টুপি পরিধান করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। পাঁচ কল্লি টুপির তাৎপর্য হলো, এটি মাথার সঙ্গে লেগে থাকে। পরিধানে সহজ ও আরামদায়ক। তাই এসব দিকে চিন্তা করে অনেকে পাঁচ কল্লি টুপির ব্যবহার করেন। টুপির ক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি হলো, টুপি রেশম, স্বর্ণ, রুপার তৈরি হতে পারবে না; কাফের ও নারীদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারবে না; অহংকার ও দাম্ভিকতাপূর্ণ হতে পারবে না। তবে সবচেয়ে উত্তম টুপি হলো, যা পরিধান করার মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ পায়।

টুপির জন্য হাদীস শরীফে তিন ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এক. 'কিমাম'। এর অর্থ গোল টুপি। (মেরকাত ও ত্বীবী শরহে মেশকাত) হাদীস শরীফে এসেছে : রাসূল (সা.)-এর টুপি এ ধরনের ছিল যে তা মাথার সঙ্গে লেগে থাকত। (তিরমিযী শরীফ)

দুই. 'বুরনুস'। এর অর্থ এমন কাপড়, যার অংশবিশেষ মাথার সঙ্গে লেগে থাকে। (আর রায়েদ)। আল্লামা জাওহারীর মতে, 'বুরনুস' বলা হয় লম্বা টুপিকে। হযরত মু'তামের (রহ.) বলেন, 'আমি আনাস (রা.)-এর মাথায় লম্বা টুপি দেখেছি।' (বুখারী শরীফ)

তিন. 'কলানসুওয়া'। এর শাব্দিক অর্থ লুক্বায়িত ও ঢেকে দেওয়া বস্তু। পরিভাষায় 'কলানসুওয়া' বলা হয়, যা মাথার ওপর পরিধান করা হয় এবং তার ওপর পাগড়ি পরিধান করা হয়। (রদ্দুল মুহতার)

মূল কথা হলো, হাদীস শরীফে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন ধরনের টুপি ব্যবহার করার কথা এসেছে। যেমন–ইয়েমেনি টুপি, শাম দেশের টুপি, কানটুপি, যুদ্ধটুপি, নকশা করা সাদা টুপি ইত্যাদি। তাই টুপি পরিধান বিষয়ে মানুষ যার যার অভিরুচি অনুযায়ী স্বাধীন। তবে এমন ধরণের সকল টুপি যেগুলো কোনো বাতিল ফেরকা বা বিধর্মীদের নিদর্শন হিসেবে ব্যবহৃত তা অবশ্যই বর্জনীয়। মৌলিক কথা হলো কিছুতেই যেন শরীয়তের সীমারেখার বাইরে না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

উল্লেখ্য, কোনো প্রতিষ্ঠানে ড্রেসকোড অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো টুপি পরিধানের বিধান রাখা হলে শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে তা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতায় টুপি

মাথা ঢাকার ইতিহাসের বয়স শরীর ঢাকার রেওয়াজ চালুর প্রায় সমান। গোড়ার দিকে মানুষ মাথা ঢাকার জন্য পাতা, পশুর চামড়া, পাখির পালক ইত্যাদি ব্যবহার করত। একসময় এটি সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। রাজা, আমাত্যবর্গ ও যোদ্ধারা মাথায় মুকুট আর শিরোস্ত্রাণ পরিধান করতে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের টুপির প্রচলন দেখা যায়। টুপির ব্যবহার ধর্মীয় হলেও ধর্মীয় অঙ্গনের বাইরে বা ধর্মীয় বিশেষ ঘরানায় আলাদা আলাদা টুপি ব্যবহারের রীতি চালু আছে। এগুলোর ব্যবহার ও ধরন হিসেবে বিভিন্ন নামও আছে। যেমন–গোল টুপি, লম্বা টুপি বা কিস্তি টুপি, পাঁচ কল্লি টুপি, চার কল্লি টুপি, জিন্নাহ টুপি, গান্ধী টুপি, নেহরু টুপি, নেপালি টুপি, মালয়েশিয়ান টুপি, শামি টুপি, তুর্কি টুপি, রুমি টুপি, পাকিস্তানি টুপি, সৌদি টুপি, আরবী টুপি, জালি টুপি, তালি টুপি, বেতের টুপি, খানকা টুপি, দরবারি টুপি, পীরালি টুপি, মুরীদি টুপি, কংগ্রেসি টুপি, বিয়ের টুপি ও ঈদের টুপি।

পারস্য : উষ্ণীষের বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর। অনেকে বলেন, পারস্যেই এর যাত্রা শুরু। প্যারিসের ল্যুভ মিউজিয়ামে পারস্যের এক দেবীমূর্তি রাখা আছে। মূর্তিটির বয়স পাঁচ হাজার বছর, দেবীর মাথায় একটি মোচাকৃতির মুকুট দেখা যায়। জরথুস্ট্র ধর্মের দেবতা আহুর মাজদার মাথায়ও টুপি বা মুকুট দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায়, টুপির বয়স হাজার হাজার বছর।

গ্রিস ও রোম : গ্রিসে উষ্ণীষের ব্যবহার দেখা যায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিনোয়ান সমাজে। মিনোয়ান নারী-পুরুষ সবাই বড় চুল রাখত আর পাতা বা ধাতু দিয়ে মুকুট বানিয়ে নিত। তবে শাসক ও ধর্মগুরুরা কাপড়ের উষ্ণীষ ব্যবহার করতেন। আফগানদের পাকল নামের টুপি আরং গ্রিকদের কাউসিয়া প্রায় একই রকম দেখতে। ধারণা করা হয়, গ্রিকরা এটি আফগানিস্তানের নুরিস্তানে নিয়ে আসে। গ্রিকরা পশ্চিম এশিয়ার (কুর্দিস্তান, সিরিয়া ইত্যাদি) দেশগুলোয়ও টুপির প্রসার ঘটিয়েছে।

চীন : খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দের আগে থেকে চীনের রাজারা সিল্কের উষ্ণীষ ব্যবহার করতেন। তাঁদের টুপিতেই প্রথম রোদ থেকে বাঁচার জন্য বাড়তি অংশের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ লোকজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠদের টুপি পরার অধিকার ছিল।

ইহুদি টুপি : টুপি ব্যবহারে ইহুদি ধর্মগুরুরা বেশ যত্নবান ছিলেন গোড়া থেকেই। মিসরে ফারাওরা মাথা ঢাকনি ব্যবহার করতেন। রানি নেফারতিতির মুকুট দেখা যায় চোঙা আকৃতির। ইহুদিদের টুপি অন্য সব টুপির চেয়ে

ছোট। অনেক ক্ষেত্রে মাথার তালুর সঙ্গে চুলের ক্লিপ দিয়ে আটকানো থাকে।

খ্রিস্টান ধর্মে টুপি : খ্রিস্টান ধর্মে টুপির ব্যবহার তেমন একটা দেখা যায় না। তবে পোপকে বিশেষ এক ধরনের টুপি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আফ্রিকা : আফ্রিকায় মুকুট বা উষ্ণীষের চল বহু পুরনো। তবে কাপড়ের টুপির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে নতুন। ইসলাম ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকায় কাপড়ের টুপির ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আরবরা টুপি ও পাগড়ি ইসলাম আসার আগে থেকেই ব্যবহার করত। তবে মহানবী (সা.)-এর সুন্নাত হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপকতর হয়। নবীজি (সা.) পাগড়ির নিচে গোল টুপি ব্যবহার করতেন। উল্লেখ্য, জলবায়ু টুপির আকার ও গড়নে বেশ ভূমিকা রেখেছে। শীতপ্রধান অঞ্চলে পশুর চামড়া বা পশমের টুপি দেখা যায় বেশি, বিশেষত উত্তর এশিয়ায়।

টুপির কয়েকটি নাম : কুফি নামের টুপির ব্যবহার দেখা যায় আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু দেশে। পাকল ব্যবহার করে আফগানরা। রাবাব বাদকরা কারাকুল নামের বিশেষ টুপি ব্যবহার করেন। এটি দেখতে অনেকটা জিন্নাহ টুপির মতো। চীনারা সাদা রঙের গোলাকার টুপি ব্যবহার করে তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ছাংসানের সঙ্গে। ইন্দোনেশিয়ায় ব্যবহার হয় রামপুরি টুপি, ওরা বলে সংকক। তারা এটি পরে সারং বা লুঙ্গির সঙ্গে। রামপুরি টুপি গেছে নেপাল থেকে। মালদ্বীপের নামাজের টুপির নাম থাখিয়া। আর মালদ্বীপের জেলেরা বিশেষ যে টুপি ব্যবহার করে তার নাম কোরাই। মালয়েশিয়ায়ও ইন্দোনেশিয়ার মতো সংকক ব্যবহার হয়। পাকিস্তানে ব্যবহার হয় পাকল, কারাকুল ও সিন্ধি টুপি। সিন্ধি টুপি বিশেষভাবে সামনে থেকে কাটা থাকে যাতে করে নামাযের সময় কপাল মাটিতে ছোঁয়ানো যায়। রাশিয়ায় ব্যবহার হয় তুবেতেইকা নামের টুপি। এটি গোল বা চারকোনা হয়ে থাকে। এতে এম্ব্রয়ডারির নকশা থাকে। বাচ্চা ও বুড়োদের তুবেতেইকার ঝুল বড় হয়। সোমালিয়ায় কোফিয়াদ জনপ্রিয়। সুদানে 'ইমামা'।

তুর্কিতে দেখা মেলে ফেজ টুপি বা টারবুশের। সাধারণত লাল রঙের হয় এবং এর ওপরের দিকের মাঝ থেকে একগুচ্ছ সূতা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া তুর্কিতে চাল্লাক, তাজ ইত্যাদি টুপিও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে আমরা গোল আর লম্বা টুপি বেশি ব্যবহার করি।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেওয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেওয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেওয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রিম বা জামানত নেওয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার : ০৮৬১২২০০০০৩১৪

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

ইলমের ওপর আমল না হওয়ার একটি বাস্তব উপমা :

ইলমের ওপর আমল না হওয়ার একটি বাস্তব উপমা প্রদান করছি। কার চলার জন্য যেমন আলো প্রয়োজন, তেমনি পেট্রলও প্রয়োজন। আলো তো ব্যাটারি থেকে আসে। ব্যাটারি বড় উত্তম বস্তু। আলো জ্বালালে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। কিন্তু পেট্রল না হলে কার চলেই না। তদ্রূপ ইলমের সাথে আল্লাহর মুহাব্বতের পেট্রল থাকতে হবে। এ কারণে অনেককে আমরা অজ্ঞ মনে করি কিন্তু আমলের মধ্যে মজবুত ও দৃঢ় হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহর মুহাব্বত তার মধ্যে আগে থেকেই আছে। এখন তার মাঝে ইলমের প্রয়োজন। ইলম চলে এসেছে আমল আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক আলেম তার বিপরীত। তার মধ্যে ইলম আছে কিন্তু আল্লাহর মুহাব্বত নেই। যার কারণে আমল হয় না।

এক লোক আমাকে একটি ঘটনা শোনালেন। তিনি বলেন, আমরা এক ব্যক্তির ওপর খুবই আস্থাশীল ছিলাম। তাঁর ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা খুবই সুন্দর ছিল। আমরা তাঁকে এখানে ওয়াজের জন্য দাওয়াত দিলাম। এগারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা তাকরীর করলেন। নামায এবং জামাআতের খুব গুরত্ব বয়ান করলেন। কিন্তু যখন দুইটা বাজে ঘুমালেন আর উঠলেন সকাল আটটা বাজে।

দেখুন, কত ইলম আছে। কিন্তু আমল নেই। ওই ব্যক্তি বলতে লাগলেন, এটি তো টেপরেকর্ডের মতোই হয়ে গেছে। বলা হলো শুনিয়ে দিলেন। আমরা আর তাঁকে আমাদের মহল্লায় দাওয়াত দেইনি।

আল্লাহভীতি ও মুহাব্বতের জন্য মেহনতের প্রয়োজন :

আসল কথা হলো, ইলমের সাথে আমল। ইলমের জন্য তো মানুষ দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। আট বছর, দশ বছর। কিন্তু আল্লাহভীতি ও আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনে এক বছর বা ছয় মাসও সময় ব্যয় করে না। সে কারণেই কোনো লোক আহলে হক্বের মাদ্রাসায় ইলম হাসিল করে, ফারেগ হয়ে আহলে বিদ'আতের মাদ্রাসা বা মসজিদে চাকরি নেয়। কী আশ্চার্য ব্যাপার? এটি আমলের কমতির কারণে হয়েছে। বলা হয় চলুক না কিছুদিন। পরে ইসলাহ করে নেব। ফলে তাদের সাথে থাকতে থাকতে তাদের রঙে রঙিন হয়ে যায়। সুতরাং ভাইয়েরা! আসল বস্তু হলো আল্লাহর মুহাব্বত ও খশিয়াত পয়দা করা।

আল্লাহর মুহাব্বত কিভাবে হাসিল হয়?

এখন কথা হলো, আল্লাহর মুহাব্বত কিভাবে সৃষ্টি হবে। আহলে মুহাব্বতের সাথে বসার মাধ্যমে মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। খরবুজা থেকেই খরবুজা রং গ্রহণ করে থাকে। তাহলে মানুষের সাথে বসে মানুষ হওয়া যাবে না কেন? সে কারণেই হাদীস শরীফে এসেছে–

اللهم انى اسئلك حبك وحب من يحبك۔

হে আল্লাহ! আমি আপনার মুহাব্বত চাই এবং তাদের মুহাববত যারা আপনাকে মুহাব্বত করে। (মিশকাত ১/২১৯)

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি এবং করুণার ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করলেও আল্লাহর মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমেও মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে মুহাব্বত পয়দা হয়। বাস, ট্রেন, বিমান ইত্যাদিতে সফর করার সময় কারো সাথে কিছুক্ষণ কথা হলে তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। একসময় বলা হয়ে যায় আপনি যখন ওই শহর বা মহল্লায় আসবেন দেখা হবে। একসময় একত্রিত হলো, একসাথে খাওয়া হলো, কথা হলো, বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এটি কিভাবে হলো? সফরে একসময় দেখা হলো, কথা হলো, পরস্পর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অথচ তাদের সাথে আগে কোনো সময় পরিচয় তো দূরের কথা, দেখাও হয়নি। একজন অপরিচিত লোকের সাথে যদি সামান্য দেখা এবং কথা হওয়ার পর দৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে তাহলে মুহসিনে আজম সকলের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহর সাথে কথা হলে মুহাব্বত সৃষ্টি হবে না কেন? তাঁর সাথে সম্পর্ক গভীর এবং দৃঢ় হবে না কেন? আল্লাহর সাথে কথা বলার ধরন হলো আল্লাহর যিকির করা। যে লোক আল্লাহর যিকির করে, সে আল্লাহর সাথে কথা বলে। হাদীস শরীফে এসেছে–

انا معه اذا ذكرنى

আমাকে যে স্মরণ করে আমি তার সাথে থাকি। (মিশকাত ১/১৯৬)

দ্বীনি কাজে লিপ্ত থাকলে সালাম করা নিষেধ :

সে কারণেই যখন কোনো লোক যিকির করতে থাকে বা যেকোনো দ্বীনি কাজে ব্যস্ত থাকে তখন তাকে সালাম করা নিষেধ। কারণ সালামের উদ্দেশ্য হলো আমার দিকে মনোনিবেশ করো, অথচ ওই লোক আল্লাহর দিকে মনোনিবিষ্ট। আর এই লোক বলছে আমার দিকে মনোনিবেশ করো।

এর উপমা এমন, কোনো লোক বড় অফিসারের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথায় মশগুল। এক কর্মচারী এসে বলল ভাই একটু এদিকে আসুন তো। এমতাবস্থায় কর্মচারীর এরূপ বলা কতই না, আহম্মকী।

সে কারণেই দ্বীনি কাজে মশগুল ব্যক্তিকে সালাম করা নিষেধ।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

প্রকৃত আলেম

الحمد لله، والصلاوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد:

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يخشى الله من عباده العلماء

কাবেলে এহতেরাম উলামায়ে কেরাম! পঠিত আয়াতটির আলোকে আমরা সবাই কমবেশি আলোচনা করে থাকি। কয়েকটি কথা আমিও বলার ইচ্ছা পোষণ করছি। কারণ প্রসিদ্ধ আছে–

اذا تكرر الكلام تقرر فى القلب

একটি বিষয় বারবার আলোচনা করা হলে তা অন্তরে গেঁথে যায়, ফলে সে অনুযায়ী আমল করে নিজেকে গড়ে তোলা সহজ হয়ে যায়। পঠিত আয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহকে ভয় করাই প্রকৃত আলেম সমাজের কাজ। অতএব যদি আলেম সমাজই আল্লাহকে ভয় না করে তাহলে কারা আল্লাহকে ভয় করবে? কারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে? আল্লাহ তা'আলা ইলমে দ্বীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছেন, তা যে পর্যায়েরই হোক না কেন। ইলমে দ্বীনের সাথে সম্পর্কের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলমে দ্বীন সংরক্ষণের পাত্র এবং সরবরাহের পাইপলাইন হিসেবে মনোনীত করেছেন। যার দ্বারা পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত এই দ্বীনি ইলম পৌঁছে থাকে। এ ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় বিষয় হলো, পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে যে পানি সাপ্লাই হবে, যেই জিনিস সাপ্লাই হবে তা স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত হওয়া। সাথে সাথে টাংকি ও পাইপলাইন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ছিদ্রমুক্ত হওয়াও জরুরি। দেখুন! পানি স্বচ্ছ-বিশুদ্ধ ট্যাংক ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু যদি পাইপের কোথাও লিক বা ছিদ্র হয়ে যায় আর সেখান দিয়ে কোনো জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে, তবে সেখান থেকে পরবর্তীতে যেখানেই পানি সাপ্লাই হবে, তা দূষিত ও জীবাণুযুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাঁর বান্দাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে মনোনীত করেছেন, আর এই দ্বীন মহামূল্যবান স্বচ্ছ একটি জিনিস। এই দ্বীনের জন্য আমরা অনেক কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে দিয়েই কালাতিপাত করছি। কিন্তু এই মেহনতের আশানুরূপ ফল তো পাচ্ছি না। কখনো আমরা দ্বীনের নামে কিছু কাজ করি। তাতেও দেখা যায় ভালোর বদলে মন্দ ও ফেতনার সৃষ্টি হয়। দ্বীনের ওপর চললে তো সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু কোনো কোনো সময় সমাধান তো হয় না, উল্টো সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ কী? ইলমে দ্বীন আল্লাহপ্রদত্ত জিনিস তাতে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই, একশ ভাগ খাঁটি-নির্ভেজাল। এই ইলম সংরক্ষণের পাত্র হলাম আমরা উলামায়ে কেরাম। আমাদের মাধ্যমেই ইলমে দ্বীন অন্যদের কাছে সাপ্লাই হয়ে থাকে। পাইপে লিক বা ছিদ্র হলে যেমন জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে পানির স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধতাকে দূর করে দেয়। এখন দেখার বিষয় হলো, আমাদের মাঝেও কোনো ভাইরাস ও জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে কি না? আর সেই জীবাণুর নাম প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, অহংকার অহমিকা, দাম্ভিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ আত্মপূজা ইত্যাদি। হযরাত সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় যেগুলোকে رذائل বলা হয়। আচ্ছা বলুন তো! আমাদের অন্তরে যদি এসব নাপাক-গন্ধা জিনিস স্থান করে নেয় তবে কি তাতে রক্ষিত দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের সাথে এগুলোর সংমিশ্রণ ঘটবে না? অবশ্যই ঘটবে! এবার এই ইলম যেখানেই সাপ্লাই করা হবে তা কিন্তু তার স্বচ্ছতা হারিয়ে জীবাণুযুক্ত ও ভাইরাস নিয়েই যাবে, এবং যার কাছে পৌঁছানো হবে তার মধ্যেও এই ভাইরাসগুলোর সংক্রমণ ঘটবে। নূরে ইলমের সাথে সাথে জুলমতেরও বিস্তার ঘটবে। ইলমের মিষ্ট স্বাদ যেমন অনুভব করা যাবে, তেমনি رذائلএর তিতা স্বাদেরও উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে। এর অর্থ এই নয় যে তা'লীম তারবীয়াত ও দ্বীনি কথা বলা ছেড়ে দিতে হবে। বরং পুরোদমে তা'লীম তারবীয় চালিয়ে যেতে হবে এবং দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত থাকতে হবে, হতে পারে যারা ইলম অন্বেষণকারী তারা ফিল্টার করে জীবাণুমুক্ত করে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ করে নেবে এবং ভ্যাক্সিনের সাহায্যে ভাইরাসমুক্ত করবে। আমাদের কাজ হবে কলবকে ভাইরাস ও জীবাণুমুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আর এই দু'আ করা, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের তালেবে ইলমদেরকে ফিকহুজজাহের ও ফিকহুল বাতেনের সমন্বয়কারী বানিয়ে দিন। কারণ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন

ও নিকট অতীতের সকল বুজুর্গদের অভীষ্ট লক্ষ্য এটাই ছিল, তাঁরা ইলমে জাহেরী অর্জনে যেমন গুরুত্ব দিতেন, তেমনি এদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন যে আমরা যে মহামানবের ইলমের উত্তরসূরি বলে নিজেদের দাবি করি তাঁর সাথে আমাদের তা'আল্লুক কোন পর্যায়ের, আমরা তাঁর কতটুকু অনুস্মরণ-অনুকরণ করছি। আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় কতটুকু কাজ করছে, তা'আল্লুক মাআল্লাহ কোন স্তরের। আমাদের দিল ও দেমাগ رذائل থেকে কতটুকু পবিত্র। বিশেষ করে আহলে ইলমের মধ্যে যেসব ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি ঘটে থাকে, তার কোনোটির দ্বারা তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা পরখ করতেন। যেমন আত্মমর্যাদা, আত্মপূজা, অহংকার, অহমিকার মতো ভাইরাস এবং নিজের মতকে চূড়ান্ত ও নির্ভুল মনে করা, যা রাসূল (সা.)-এর ভাষায়–

ودنيا موثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه

এ ধরনের ভাইরাসের উপস্থিতি আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখতেন। সত্যিকারার্থে আমরা যদি সেসব মহা মনীষীদের প্রকৃত উত্তরসূরি হয়ে থাকি তাহলে আমাদেরকেও নিজেদের দিল ও দেমাগের এক্স-রে করে, কার্যকলাপের অডিট করে রিপোর্ট কী বের হয় তা দেখা দরকার। কোথাও সেসব রোগের উপস্থিতি আছে কি না, যা স্বয়ং রাসূল (সা.) চিহ্নিত করে দিয়েছেন। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, অমুক বিষয়ে যা করেছি যা বলেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছি, যে অবস্থান গ্রহণ করেছি তা কেন? তা আবার রাসূল (সা.)-এর অমর বাণী

هوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه

প্রবৃত্তির তাড়না, পার্থিব স্বার্থ বা আত্মপূজার হওয়ার কারণে ছিল না তো। আরো একটি হাদীসের মাধ্যমে নিজেদের কার্যকলাপকে পরখ করুন, দেখুন! রিপোর্ট কী বের হয়, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

الاثم ما حاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس

যে বিষয়ে তুমি দ্বিধাদণ্ডে ভুগবে বা যা লোকে জানলে তোমার মানহানি হওয়ার ভয় হয়, সেটাই অপরাধ। উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় অপরাধ নির্ণয় করা অতি সহজ। মনে রাখবেন, অন্যকে ধোঁকা দেওয়া যতটা সহজ নিজেকে ধোঁকা দেওয়া তত সহজ ব্যপার নয়। আল্লাহর বাণী চির সত্য অমর,

بل الانسان على نفسه بصيرة

ইখতেলাফে-রহমতের বদলে ঘৃণা কেন

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন,

اختلاف امتى رحمة

অর্থাৎ আমার উম্মতের মতবিরোধ তাদের জন্য রহমত বয়ে আনবে। উল্লিখিত হাদীস থেকে দুটি জিনিস বুঝে আসে। (এক). এই উম্মতের মধ্যে মতবিরোধ হবে। (দুই). তাদের মতভেদ তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে না, বরং তাদের সমস্যার সমাধানের মাধ্যম হবে, যা মূলত একটি রহমত। (তিন). এই হাদীসে অতি সূক্ষ্মভাবে তৃতীয় আরেকটি জিনিসের দিকে ঈঙ্গিত করা হয়েছে যে এই উম্মতের মধ্যে ইলম ও রিসার্চের ধরাবাহিকতা আবহমানকাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। কারণ মতভেদ তখনই হতে পারে, যখন ইলম ও গবেষণার ধারা চালু থাকবে এবং জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খোঁজা হবে। যাদের মধ্যে এই অনুরাগ থাকবে না তাদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কথা না!

গ্রুপিং

বর্তমানে কিছু কিছু বিষয়ে ইখতেলাফের যেই অবস্থা, যেই ধরন তাতে করে ইখতেলাফ আমাদের জন্য রহমত নয় উল্টো পীড়াদায়ক ও মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উম্মতের পেরেশানি হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কারো পরিচয়েও এদিকটি তুলে ধরা হয় যে, সে অমুক গ্রুপের, অমুকের সমর্থক, অমুকের দলের। এভাবেই সৃষ্টি হয়ে থাকে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, আর কুপ্রভাব পড়ে উস্তাদ, ছাত্র–সকলের ওপর। ফলে তারা লিপ্ত হয় গ্রুপিংয়ে। এভাবেই পরস্পরের সম্পর্কে চিড় ধরে, যা একসময় জোড়াতালির ও অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

কারণ ও প্রতিকার

কিন্তু প্রশ্ন হলো, দ্বীনি বিষয়ে ইখতেলাফ আমাদের জন্য রহমত না হয়ে পীড়াদায়ক হওয়ার কারণ কী? কারণ অনেক কিছুই হতে পারে, তবে একটি মৌলিক কারণ হলো ইখতেলাফের আদব বজায় না রাখা সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করা। দেখুন! সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দ্বীনি বিষয়ে ইখতেলাফ হয়েছে তবে আদব বজায় রেখে। তাবেঈন, তাবেতাবেঈনের মধ্যে ইখতেলাফ হয়েছে, তবে ইখতেলাফের আদব অনুসরণ করে। ফুকাহায়ে কেরামের মাঝেও ইখতেলাফ হয়েছে তবে ইখতেলাফের আদবের দীক্ষা নিয়ে। বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই বরং নিকট অতীতে আমাদের আকাবেরে দেওবন্দের মাঝেও কিছু কিছু বিষয়ে ইখতেলাফ হয়েছে তবে ইখতেলাফের আদবের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রেখে। আকাবেরে দেওবন্দের ইখতেলাফের ধরন কী ছিল তার দু-একটি ঘটনা নমুনাস্বরূপ প্রদত্ত হলো :

হযরত মদনী (রহ.) ও মুফতী শফী (রহ.)-এর ঘটনা

جورب منعل

(এক ধরনের মোজা, যার তলদেশে চামড়া আর অবশিষ্ট পুরো অংশ কাপড়ের) এর ওপর মাসেহ করা বৈধ কি না? এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের কিতাবাদিতে স্পষ্ট হুকুম বর্ণিত হয়নি। তাই হযরত মদনী (রহ.) ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তির আলোকে তার ওপর মাসেহ বৈধ হওয়ার মত ব্যক্ত করেন, তখন তিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন। অন্য দিকে দারুল উলূমের সদর মুফতী ছিলেন মুফতী শফী (রহ.)। তিনি

جورب منعل

এর ব্যাপারে ফাতওয়া দিলেন তার ওপর মাসেহ বৈধ না হওয়ার। উভয়ে যেহেতু একই প্রতিষ্ঠানের উস্তাদ ছিলেন তাই ইখতেলাফ নিরসনের প্রতিও তাঁদের আগ্রহের কমতি ছিল না। একদিন উভয়ে দারুল ইফতায় এ বিষয়ে আলোচনায় বসলেন, দলিলভিত্তিক আলোচনা হলো, এভাবে মোট তিন দিন আলোচনা হলো, কিন্তু দলিলের ভিত্তিতে উভয়ে যার যার মতের ওপর অনড়। তিন দিন আলোচনার পরও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারায় হযরত মদনী (রহ.) বললেন, মুফতী সাহেব! আপনার মত ও দলিলের ওপর আমার কলব তৃপ্ত নয়। আর আমার মত ও দলিলের প্রতি আপনি সন্দিহান। অতএব প্রত্যেকে যার যার মতের ওপর অটল থাকি, এটাই শ্রেয়। এরপর একদিনের ঘটনা, মুফতী শফী (রহ.) কোনো এক কাজে হযরত মদনী (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হন। সেখানে আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে যায়, হযরত মদনী (রহ.) ওজু করলেন এবং জাররাবের ওপর মাসেহ করলেন, যে ব্যাপারে দুই হযরতের মধ্যে ছিল অমীমাংসিত ইখতেলাফ। স্বাভাবিক কথা হযরত মদনী (রহ.) যেহেতু বড় ছিলেন আবার স্থানটি ছিল তাঁর নিজের তাই ইমামতি তিনি নিজেই করবেন। কিন্তু তিনি বললেন, মুফতী সাহেব! আপনার রায় অনুযায়ী আমার ওজু হয়নি তাই আমার পেছনে আপনার নামায হবে না। অতএব আজ আপনিই আমাদের ইমাম হবেন। এরপর সবাই মুফতী শফী (রহ.)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করেন। এটাই আমাদের আকাবেরদের ইখতেলাফের ধরন, তাঁরা ইখতেলাফ করেছেন আবার ইখতেলাফের আদব ও শিখিয়েছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ও হযরত থানভী (রহ.)-এর ঘটনা

এটা তাহরীকে খেলাফতের সময়কার কথা। তাহরীকে খেলাফতের কিছু বিষয়ে হযরত থানভী (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল। কিছু লোক তাহরীকে খেলাফতের ব্যানারে থানাভনে কনফারেন্স করতে চাইলেন, কিন্তু হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) এই বলে তা মঞ্জুর করলেন না যে, দেখো! তাহরীকে খেলাফতের ব্যাপারে আশরাফ আলীর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। অতএব তার শহরে তার এলাকায় গিয়ে এ বিষয়ে কনফারেন্স করা অনুচিত। এ ছাড়া সে আমার ছাত্র, আমি গেলে সে আমার খাতিরে হলেও আসবে তবে এক ধরনের চাপ নিয়ে আসবে। আরেকটি বিষয় হলো, সে আসুক না আসুক, উভয় অবস্থাতেই সে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হবে। অতএব তার এলাকায় তাহরীকে খেলাফতের কনফারেন্স হতে পারে না। দেখুন, এখানে উস্তাদ-শাগরেদের ইখতেলাফ, যদি ছাত্র উস্তাদের প্রতি লক্ষ করে এমনটি করে তাহলে স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু এখানে উস্তাদ তার ছাত্রের মতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কত বড় মনের পরিচয় দিলেন!

اولئك آبائى فجئنا بمثلهم

اذا جمعتنا ياجرير المجامع

মোট কথা হলো, ইখতেলাফ আদব রক্ষা করে হলে তা উম্মতের জন্য রহমতের দরজা খুলে দেবে। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি সাংঘর্ষিক মনে হলেও প্রতিটির প্রয়োগ ক্ষেত্র ভিন্ন হয়ে থকে। যা আজ বুঝে না আসলেও একদিন বুঝে আসবে।

বর্তমানে ইখতেলাফ রহমত না হওয়ার আরো কিছু কারণ আছে, যেগুলির সম্পর্ক কলবের সাথে। তা হলো ইলমের সাথে প্রবৃত্তিতাড়িত কোনো নাপাক জিনিসের সংমিশ্রণ। যেমন–অর্থ, স্বার্থ, অহমিকা, দাম্ভিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মপূজা, বড়ত্ব, আরো আছে তা'আসসুব-অঞ্চলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির মতো ঘৃণিত ও নিন্দিত জিনিস। যেখানে মানুষ ভালো-মন্দ, হক্ব-নাহক্ব, ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারে না। কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করে না। শুধু দেখে স্বজন কী বলেছে, কী করেছে, কোন দিকে মোড় নিয়েছে, কী তার অভিমত? এর বাইরে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়–কোনো কিছুই যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করে না।

ইখতেলাফ রহমতের কারণ না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, বদগুমানী, বদ জবানি ও ভিন্নমত পোষণকারীকে হেয়প্রতিপন্ন করার মানসিকতা, যা ঘরে-বাহিরে, সভা-সমাবেশে, দরসে চায়ের টেবিলে সর্বত্রই অহরহ হচ্ছে। শুনেছি। দেখিওনি-বুঝিও না ফেসবুক-টুইটার এ-জাতীয় আরো কিছু যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এ কাজগুলো দেদার হয়ে থাকে। বলুন তো, এরা কারা? তাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি? কখনো কি তাদেরকে বারণ করেছি? নাকি তারা নিজেদেরই নিয়োজিত, সমর্থনপুষ্ট! ন্যায়ের ওপর থাকলে এত কিছুর আয়োজন করতে হয় না। অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্যকে আক্রমণ করার মধ্যে বীরত্বের

কী আছে? তাতে কী অন্যায় কখনো ন্যায়ে পরিণত হবে? না, কখনো না। বরং হক্ব ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করাই বীরত্বের লক্ষণ!

দারুল উলূম দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য

দেখুন! বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে হক্কানী উলামায়ে কেরামের যেসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দৃষ্টিগোচর হয়, সব কিছুই দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েজ। মসজিদ, মাদ্রাসা, খানেকাহ, বিভিন্ন একাডেমি, দাওয়াত, তাবলীগসহ এ ধরনের দ্বীনি কাজের ক্রমধারা আছে সব কিছুই দেওবন্দের ফয়েজ। যা আজ বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করছে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, জাপান, চীন, রাশিয়াসহ এশিয়ার প্রতিটি দেশেই দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েজের বিস্তার ঘটছে। পরিমাণে কোথাও কম, কোথাও বেশি। এর পেছনে মূলত দারুল উলূমের দুটি বৈশিষ্ট্য কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে।

এক. ইলমে জাহেরে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা। দুই. বাতেনী তারবীয়াত, কলব ও বাতেনের এছলাহ/সংশোধন। উল্লিখিত প্রথম বৈশিষ্টটি তো অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও আছে, অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি দারুল উলূম দেওবন্দ ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে নেই। মিসরের জামেআতুল আযহারে প্রথম বিষয়টির উপস্থিতি পুরোপুরি পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টির দৈন্যতা তাদের মাঝে স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। হযরত মাওলানা ইয়াসীন সাহেব (রহ.) বলতেন,

میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا جب دارالعلوم کے مہتمم اور شیخ الحدیث سے لے کر چپراسی اور چوکی دار تک صاحب نسبت ولی اللہ ہوتے تھے۔

আমি দারুল উলূমের সেই যুগ দেখেছি যখন দারুল উলূমের মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস থেকে নিয়ে পিওন এবং দারোয়ান পর্যন্ত সবই সাহেবে নিসবত ছিলেন। ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন, দারুল উলূম দেওবন্দের ফয়েজ বিশ্বময় বিস্তার লাভ করার ক্ষেত্রে ইলমে জাহেরীর ভূমিকা নেই। এটা তো অন্য প্রতিষ্ঠানেও ছিল। মূল চালিকাশক্তি হলো কলব ও বাতেনের ইসলাহ। নিজেকে ইলমে বাতেনের রঙে রঙিন করা এবং এই গুণে গুণান্বিত হওয়াই ছিল আকাবেরে দেওবন্দের ব্রতী ও একক বৈশিষ্ট্য। এটাই সেই বৈশিষ্ট্য, যা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সা.) থেকে পেয়েছেন। মূলত আকাবেরে দেওবন্দ ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের জীবন্ত নমুনা। পরিশেষে সকলের প্রতি আকুল আবেদন হলো, আকাবেরে দেওবন্দের এ দুটি বৈশিষ্ট্যের (১. ইলমে জাহেরে বুৎপত্তিলাভ এবং ২. ইসলাহে বাতেনের প্রতি সর্বাধিক মনোযোগ) বাস্তবায়ন করতে পারলে হাদীসে রাসূল (সা.)

اختلاف امتی رحمة

এর প্রতিফলন আমাদের বেলায়ও ঘটবে এবং প্রকৃত আলেম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব হবে। ইনশাআল্লাহ।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে আল-আবরার

নিউ রূপসী কার্পেট

সকল ধরনের কার্পেট বিক্রয় ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

স্বত্বাধিকারী : হাজী সাইদুল কবীর

৭৩/এ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন : ৮৬২৮৮৩৪, ৯৬৭২৩২১

বি.দ্র. মসজিদ-মাদরাসার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ থাকবে।

দ্বীনের দাঈ ও খাদেমদের পরস্পর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

দ্বীন ইসলাম সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, মুসলমানদের অন্তরে ভালো কাজের আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার মনোভাব সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলছে, চাই তা যে সহীহ পদ্ধতিতেই হোক না কেন এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যেমন সন্দেহাতীত, তেমনি সেগুলোর গুরুত্বও সর্বজনস্বীকৃত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে তাদের প্রত্যেকের যে শুধু নিয়্যাত ও কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন তাই নয় বরং চিন্তাধারা, কর্মকৌশল, নিয়ম-কানুন ইত্যাদির বিচারেও একে অপর থেকে পৃথক। এমতাবস্থায় দ্বীনি মারকাজ ও মাহফিল, আন্দোলন ও সংগঠন এবং মাদ্রাসাসমূহ ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক; সর্বোপরি দ্বীনের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দাঈদের পারস্পরিক আচরণ ও উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত তা জেনে নেওয়া দরকার।

আমাদের অবস্থান :

দ্বীন ইসলাম হলো একটি দুর্গ, শান্তি-সুখের রাজপ্রাসাদ। যে ব্যক্তি এর মধ্যে প্রবেশ করবে সে ঝড়-তুফান, ঘূর্ণিবায়ু এবং অগ্নিঝড়ের চেয়েও মারাত্মক বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতের চির সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার অধিকারী হবে। সুতরাং সাধারণ দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ যেমন কারো একক প্রচেষ্টায় অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। বরং ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, জোগালিসহ সকল কর্মচারীর যৌথ প্রচেষ্টা জরুরি। তদ্রূপ দ্বীনের এ দুর্গ বা রাজপ্রাসাদও শুধু যে কোনো এক দলের প্রচেষ্টা বা মেহনতে পরিপূর্ণভাবে ওজুদে আসতে পারে না। বরং তার জন্য জরুরি হলো দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত সব দলের যৌথ তৎপরতা এবং প্রচেষ্টা।

তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া মৌলিক বিষয় :

এ বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে আগমনের মৌলিক যেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : (তরজমা) "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের অন্তরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কোরআন ও সুন্নাহ।" (সূরা জুমু'আ, আয়াত নং-২)

উক্ত কাজগুলোর কোনো একটির ব্যাপারেও নির্দিষ্ট করে এ কথা বলা যাবে না যে মূল হচ্ছে এ কাজ; আর অন্যগুলো গৌণ; মর্যাদা ও গুরুত্বের বিচারে এটা অগ্রগণ্য আর বাকিগুলো তেমন নয়।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ও তার মর্যাদা :

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (রহ.) এ কথাটি বড় সুন্দর করে বলেছেন। তিনি বলেন : 'অভিন্ন জাত ও অভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যেই শুধু তুলনা চলে। পরস্পর বিপরীত দুই বস্তুর মধ্যে তা হয় না। সুতরাং কেউ যদি প্রশ্ন করে চোখ বেশি জরুরি, নাকি কান বেশি জরুরি? তাহলে বলা হবে স্ব-স্ব স্থানে উভয়টিই জরুরি। এ ক্ষেত্রে তুলনা করাই ভুল। তবে এটা বলা যেতে পারে যে উভয় চোখের মধ্যে যে চোখে ভালো দেখা যায় সে চোখ বেশি ভালো। আর উভয় কানের মধ্যে যে কানে ভালো শোনা যায় সে কান বেশি ভালো।

উপরোক্ত উদাহরণের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে কেউ যদি প্রশ্ন করে "তা'লীম, তাযকিয়া ও তাবলীগের মধ্যে কোনটা বেশি জরুরি?" তাহলে তার এই প্রশ্ন ঠিক হবে না। কেননা এগুলো প্রতিটি পৃথক পৃথক বিষয়। আর ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে তুলনা চলে না। সুতরাং উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ই জরুরি। অর্থাৎ স্ব-স্ব স্থানে তা'লীম যেমন জরুরি, তেমনি তাবলীগও জরুরি। অনুরূপভাবে তাযকিয়াও জরুরি। বরং তাবলীগ ও তা'লীম কবুল হওয়ার জন্য তাযকিয়া অপরিহার্য। (মাজালিসে আবরার : ২৯৪)

শাখাত্রয়ের পরস্পর সম্পর্ক এবং তার উপকারিতা :

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (রহ.)-এর একটি কথা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন : 'মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ নিজের শরীরের কোনো অঙ্গকে তুচ্ছ মনে করে না। অঙ্গসমূহের পৃথক পৃথক কাজের কোনো তুলনাও করে না। এমনকি এক অঙ্গকে অপর অঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না। এমনিভাবে দ্বীন ইসলামও একটি দেহসদৃশ। তার বিভিন্ন অংশ আছে। কেউ মাদ্রাসায় তা'লীম তারবীয়াতের কাজ করছে, কেউ তাবলীগ করছে, আবার কেউ খানকায়ে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজ করছে। এমতাবস্থায় দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা

একে অপরকে তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান করে কিভাবে? তা ছাড়া পরস্পরে কাজের তুলনা করা বা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীই বা মনে করার সুযোগ কোথায়! এ কারণেই দেখা যায় যে পূর্ববর্তী আউলিয়ায়ে কেরাম দ্বীনের সব ধরনের খাদেমদের ইকরাম ও তা'যীম তথা শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة : ٢)

অর্থাৎ ভালো কাজে পরস্পর সহযোগিতা করার নির্দেশ দিতেন। সুতরাং একে অপরকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। 'আমাদের' ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে, 'আমাদের' মাদ্রাসা চলছে, 'আমাদের' দল আগে বাড়ুক–এসব কী ধরনের কথা? দ্বীনকে সামনে রাখুন। নিজেকে পেশ করবেন না। কারোর বয়ান দ্বারা যদি সমাজের ব্যাপক উপকার হয় বা কোনো মাদ্রাসা দ্বারা যদি দ্বীনের উপকার হয় তাহলে হিংসা বা আত্মপীড়নের কী আছে?' (মাজালিসে আবরার, পৃ. ৮৪)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের শক্তিশালী মুখপাত্র ও নির্ভীক সৈনিক আল্লামা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.) বলেন, 'এ কাজ (দাওয়াত ও তাবলীগ) ছাড়াও দ্বীনের আরো অনেক কাজ ও শাখা আছে। যেমন–মক্তব, মাদ্রাসা ও দ্বীনি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। অন্তর থেকেই সেগুলোকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা চাই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য আমাদের অন্তরে হামদর্দী ও সহানুভূতি থাকা উচিত। আল্লাহ তা'আলার যেসব বান্দা ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে এসব বিষয়ে নিজেদের শ্রম ও কোরবানী পেশ করে যাচ্ছেন, সেসব বান্দাদেরকে যথাযথ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ না করুন! আমাদের কাজকেই যদি দ্বীনের একমাত্র কাজ মনে করি আর দ্বীনের অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি হয় তাহলে এটা হবে আমাদের গোমরাহী ও বদনসিবী। বরং দ্বীনের দাবিতে বদদ্বীনি হবে। নিজেদেরকে বিশেষ করে হক্কানী-রব্বানী উলামায়ে কেরাম ও আহলুল্লাহদের খাদেম ও অনুগত ভৃত্য মনে করবে। তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সময়ে সময়ে তাদের খেদমতে হাজির হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখাকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় প্রয়োজন মনে করবে।' (আল ফুরকান, পৃ. ৭, ভলিয়ম-১৯)

ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন : 'আমাদের এই আন্দোলনের (দাওয়াত ও তাবলীগ) সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানগুলো যদি 'বাণীনির্ভর' বিষয়গুলোকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে ইখলাসের সাথে কাজ করে তাহলে আমাদের উচিত তাদের সাথে ইখতিলাফ না করা। বরং তাদের কাজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করা ও স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। সাথে সাথে তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা।' (মাসিক আল ফুরকান : পৃ. ৩-৫, ভলিয়ম-২০)

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) বলেন, 'উম্মতে মুসলিমাকে আজ চতুর্মুখী ফিতনা ঘিরে রেখেছে। ফিতনার যেন ঝড়-তুফান চলছে। কিংবা মুষলধারে বর্ষণ চলছে। এই চতুর্মুখী ঝড়-তুফানের মোকাবিলা করা কোনো এক জামাতের পক্ষে সম্ভব নয়। একেকটি জামা'আতকে এখন একেকটি ফিতনার মোকাবিলায় শক্তভাবে দাঁড়ানো উচিত এবং জান, মাল, চিন্তা-ভাবনা ও শক্তি-সাধনা সেই কাজেই পূর্ণভাবে নিয়োজিত করা উচিত। কাজের পথ ও পন্থা ভিন্ন হতে পারে এবং ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তবে অন্যান্য দ্বীনি মেহনতের প্রতিও হামদর্দী ও সহানুভূতি থাকতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক জামা'আত যদি আচরণে ও উচ্চারণে এ কথা বোঝায় যে এটাই একমাত্র কাজ এবং একমাত্র কর্মপন্থা। সুতরাং এটাই সবার করা উচিত তাহলে এটা হবে গুরুতর ভুল। কেননা আসল উদ্দেশ্য দ্বীনের খেদমত। আর কোনো মানুষ যদি ইখলাসের সাথে দ্বীনের কোনো খেদমতে নিয়োজিত থাকে তাহলে তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং দু'আ ও সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু উদার মানসিকতা ও সহমর্মিতা আমাদের মাঝে এখন একেবারেই অনুপস্থিত। এটা অনেক রকম সমস্যা সৃষ্টি করে এবং দ্বীনের বড় ধরনের ক্ষতি করে। এতে উম্মতের বিভিন্ন তবকার মাঝে অযথা ব্যবধান ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। (১৪২১ হিজরীতে ঢাকার বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে তিনি এ বয়ানটি করে ছিলেন।)

বর্তমান পরিস্থিতি :

আল্লামা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.) বলেন : 'দ্বীনের অপরাপর আন্দোলনের ও প্রতিষ্ঠানের খেদমত ও অবদান স্বীকার না করা, সেগুলোকে যথার্থ মূল্যায়ন না করা এবং সামান্য ইখতেলাফ ও মতানৈক্যের কারণে সমালোচনামুখর হওয়া যামানার এক মহামারি ব্যাধি হয়ে দেখা দিয়েছে। আর শয়তানও এ কাজে বিরাট সফলতা পেয়ে গেছে। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের এ রকম মনোভাব সৃষ্টি করে উম্মতের দায়িত্বশীল লোকদেরকে শতধাবিভক্ত করে দিয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই একে অপরের দোষ চর্চায় মেতে উঠেছে। কিন্তু তার গুণ ও অবদানের কোনো আলোচনাই নেই। (মাসিক আল ফুরকান, পৃ. ৩, ৪, ও ৫, ভলিয়ম : ২০)

আজ বাতিল যেখানে বিভিন্ন আকৃতি ও অবয়বে যে শুধু আত্মপ্রকাশ করছে তা-ই নয় বরং সমস্ত কুফরি শক্তি এক প্ল্যাটফর্মে জমা হয়ে ইসলামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোরআনের ভাষায় :

(وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) (الأنبياء : ٩٦)

অর্থাৎ 'প্রত্যেক উঁচু ভূমি হতে তারা দ্রুত ছুটে আসছে।' এমন নাজুকতম পরিস্থিতিতে আহলে হকের ঝাণ্ডাবাহী কর্মীদের এ অবস্থা বিদ্যমান থাকা খুবই পরিতাপের বিষয়। উচিত ছিল আপসে মুহব্বত ও ভালোবাসার আবহ গড়ে তোলা; যাতে পরস্পর সম্পর্ক ভালো থাকে।

পরিস্থিতির দাবি :

এ নাজুক পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেরই উচিত সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী পছন্দমতো যেকোনো দ্বীনি কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা। যিনি যে শাখাতেই কাজ করুন না কেন তিনি মূলত দ্বীনেরই কাজ করছেন। দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা একে অপরের সহকর্মী ও সহযোগী।

দুঃখ-দুর্দশায় শরিক হওয়া সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা চাই। সর্বোপরি একে অপরের খেদমতসমূহের প্রশংসা করা এবং তার কাজের তরক্কী ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা। এ জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।

১. ইহতিমামের সাথে একে অপরের জন্য দু'আ করা এবং পরস্পর একে অপরের নিকট দু'আর দরখাস্ত করা। এতে লাভ এই হবে যে প্রত্যেকেই অপরকে নিজের জন্য দু'আ করণেওয়ালা মনে করবে। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। কারো কোনো ভুল-ত্রুটি প্রকাশ পেলে আপসে বা বৈঠকে আলোচনা-সমালোচনা না করা বরং হামদর্দী ও সহানুভূতির সাথে তা সংশোধনের চেষ্টা করা। অথবা যাদের দ্বারা এর সংশোধন সম্ভব তাদেরকে অবহিত করা।

২. সময়-সুযোগ মতো পরস্পর মিলিত হয়ে একে অপরের কাজে খোঁজ নেওয়া। কাজের তরক্কী ও অগ্রগামিতায় আনন্দ প্রকাশ করা। কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য করা এবং সুপরামর্শ দেওয়া।

৩. নিজের মহল্লার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা। যেখানে যে কাজের প্রয়োজন দেখা দেয় সে কাজের যোগ্য লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করা।

৪. নিজেদের কাজের পরিচিত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করা এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য এমনভাবে উৎসাহ দেওয়া, যাতে দ্বীনের অন্যান্য কাজের সাথে তুলনাও না হয় আবার তুচ্ছজ্ঞান করাও না হয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেবে যেন উদার মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে। (মাওলানা ইফজালুর রহমান কৃত 'বা হামী রবত কেয়ছা হো?')

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাযহাব অনুসরণ; তাৎপর্য ও বাস্তবতা

মুফতি আবুল কাসেম নোমানী মুহতামিম : দারুল উলূম দেওবন্দ
অনুবাদ : সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী

[১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, মোতাবেক ১ রবিউস সানী ১৪৩৪ হিজরী, রোজ বুধবার, দারুল উলূম দেওবন্দে অনুষ্ঠিতব্য "তাহাফ্ফুজে সুন্নাহ" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় পঠিত সভাপতির লিখিত বক্তব্যের সরল অনুবাদ]

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنامحمدواله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. امابعد!

গোটা পৃথিবীর পালনকর্তা মহান আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও মেহেরবানি, তিনি আমাদেরকে ঈমানের দৌলত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত সরল পথ ও সঠিক মতাদর্শ- ماأناعليه واصحابى "আমার ও আমার সাহাবায়ে কেরামের মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত উৎকৃষ্ট দল "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের" অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে আকিদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতিতে সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনের অনুসরণ করার তাওফিক দান করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ। এই মহা অনুগ্রহের ওপর আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করছি। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানদেরকে এই হিদায়াতের পথে অটল থাকার তাওফিক দান করুন, আমীন।

অতঃপর আপনাদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শুকরিয়া আদায় করা অধমের নৈতিক কর্তব্য মনে করছি। কেননা আপনারা নিজেদের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাদের ক্ষুদ্র আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং সফরের গ্লানি সহ্য করে আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দে তাশরীফ এনেছেন। নিঃসন্দেহে এটি দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে আপনাদের আন্তরিক সম্পর্ক, নিখুঁত ভালোবাসা ও দারুল উলূমের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়ার বড় প্রমাণ বহন করে।

সাথে সাথে আপ্যায়নের দায়িত্ব আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আপনাদের যথাযোগ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে পরিনি। আশা করি 'মাদরে ইলমী' আপন প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাকিয়ে আমাদের দুর্বলতাকে ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তা'আলা এই কনফারেন্সকে ভরপুর কামিয়াব ও পূর্ণ সফলতা দান করুন। আমীন।

মহাত্মা উলামায়ে কেরাম! এই সম্মেলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনারা সম্যক অবগত আছেন। দাওয়াতনামায় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আমাদের "গায়রে মুকাল্লিদ" ভাইরা [যারা মাযহাব মানে না] যারা নিজেদের "আহলে হাদীস" বলে পরিচয় দিয়ে থাকে তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মুসলমানরা প্রতিনিয়ত যে সকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে তা অনুধাবন করা এবং তার প্রতিরোধে কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা।

বর্তমান পরিস্থিতি এই যে "গায়রে মুকাল্লিদ" ভাইরা বিগত কয়েক বছর ধরে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারণ ও দ্রুতগামী করার লক্ষ্যে খুবই ভয়ানক ও ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করে চলছে। তারা বিভিন্ন এলাকায় সহজ-সরল মুসলমান, দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে অবগত নয়, এমন শিক্ষিত সমাজকে হাদীসের ওপর আমল করার নামে পথভ্রষ্ট করে চলছে। তারা দাবি করছে যে হাদীসের ওপর একমাত্র তারাই আমল করে থাকে, অন্যরা সকলেই হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী। অর্থাৎ যে সকল মুসলমান দ্বীনের ওপর আমল করার জন্য ও কোরআন-হাদীস বোঝার জন্য ইমাম চতুষ্টয়ের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে কারো "তাকলিদ"-অনুসরণ করেন তাঁরা সকলেই গোমরাহী ও পথভ্রষ্ট।

বর্তমানে তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। নিজেরা তো কারো অনুসরণ করেই না, বরং অনুসরণযোগ্য মুজতাহিদ ইমামগণের দুর্নাম ও কলঙ্ক রটাচ্ছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিশেষত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে এই আক্রমণের মূল টার্গেট বানিয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তাদের কোনো কোনো ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাহানি ও তাঁদের শানে বেয়াদবিমূলক আচরণের দৃষ্টতা দেখিয়েছে। এই ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ফলে বিভিন্ন স্থানে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক জায়গায় পূর্বসূরিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার বিষয়টিও আহত হচ্ছে। বিশেষত যে সকল এলাকার

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আরব বিশ্বে কর্মরত আছে তারা এই ফেতনা দ্বারা খুব বেশি প্রভাবান্বিত হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় তাদের সংগঠন বেতন-ভাতা দিয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে। মূলত তারাই এই ফিতনা সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সারকথা, ফিতনায়ে গায়রে মুকাল্লিদিয়্যাত বা লা-মাযহাবী ফিতনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

অবশ্যই, আহলে হক্বের প্রতিনিধিত্বকারীরাও নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী এই ফিতনাকে দমন করার জন্য চেষ্টা-মেহনত অব্যাহত রেখেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দে প্রতিনিয়ত আগত সংবাদ দ্বারা তাই অনুভূত হয় এবং দারুল উলূমের শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে তা স্বচক্ষে পরিদর্শন করে আসছেন। বিভিন্ন শহরে "তাহাফফুজে সুন্নাত" নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্যান্য মাদ্রাসার শিক্ষকমণ্ডলী, মসজিদের ইমামগণও নিজেদের গণ্ডির ভেতরে থেকে সাধ্যানুযায়ী মেহনত-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বয়ং দারুল উলূম দেওবন্দে "তাহাফফুজে সুন্নাত" নামক একটি বিভাগ কয়েক বছর ধরে চালু রয়েছে। তাতে এ বিষয়ে ছাত্রদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় স্থানে বিভিন্ন সময় এই ফিতনা দমনে উক্ত বিভাগ অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বাধ্য করেছে যে এই কাজকে আগের তুলনায় আরো সুসংগঠিত ও সুচারুরূপে মজবুত ও সুদৃঢ় করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কর্মপন্থা ও কৌশল নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আপনাদের এখানে সমবেত হওয়ার আহ্বান করা হয়েছে।

জাতীয় ঐক্য ও দারুল দেওবন্দের অবস্থান :

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম! এই পেক্ষাপটে আমাদের স্মরণ রাখা অত্যন্ত জরুরি যে আমাদের উদ্দেশ্য অনৈক্য ও মতবাদ মিটিয়ে দেওয়া, তা বাড়িয়ে দেওয়া নয়। দারুল উলূম দেওবন্দ সদা জাতিকে ঐক্যের আহ্বান করে এবং ঐক্যের জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগও গ্রহণ করে থাকে। উম্মতের অনৈক্য ও ভেদাভেদ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সমূহ উপকরণ গ্রহণ করে তা বিলুপ্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যায়। এ বিষয়ে আকাবিরে দেওবন্দের অবস্থানের সারাংশ হলো, উম্মতে মুসলিমাকে সদা কোরআন-সুন্নায় আদর্শবান ও পাবন্দ রাখা। আর কোরআন-সুন্নার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাহাবায়ে কেরাম, ইমামগণ ও পূর্বসূরি আসলাফদের মতাদর্শের অনুসরণ একান্ত কর্তব্য মনে করা এবং যারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই চিন্তাধারা ও মতাদর্শের বিপরীত নতুন নতুন বিষয় উত্থাপন করবে এবং তা দ্বারা মুসলিম জাতিকে বিবাদ ও সন্দেহে লিপ্ত করবে তাদের সমুচিত জবাব দেওয়া এবং তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলোর স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া উলামায়ে কেরামের নৈতিক দায়িত্ব ও আদর্শিক কর্তব্য মনে করে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণের এই দায়িত্বের কথা নিম্নের হাদীস শরিফে বর্ণনা করেছেন।

عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى ، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين (مشكوة :ص٣٦)

অর্থ : হযরত ইব্রাহীম বিন আব্দুর রহমান আযরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এই জ্ঞানভাণ্ডার প্রত্যেক পরবর্তী ন্যায়পরায়ণ লোকেরা বহন করবে। যাঁরা অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি ও বাতিল সম্প্রদায়ের অপব্যাখ্যা থেকে এবং অজ্ঞ লোকদের ভুল বিশ্লেষণ থেকে দ্বীনকে রক্ষা করবেন। (মিশকাত, পৃ. ৩৬)

উক্ত হাদীসের আলোকে প্রত্যেক ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকের ওপর এই দায়িত্ব আরোপিত হয়, তারা যেন এই নব-আবিষ্কৃত মতাদর্শের নতুন নতুন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে অবিহিত করেন। বিদ'আত, কুসংস্কার ও নিত্যনতুন সৃষ্ট বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে মুসলিম সমাজকে সজাগ রাখেন।

আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, এটি অত্যন্ত ঘরোয়া ব্যাপার। তাই এই মতানৈক্যের ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরি। এমন কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক, যা দ্বারা ইসলাম-বৈরী শক্তি উপকৃত হতে পারে। যখনই মুসলমানদের কোনো সমষ্টিগত বিষয় এসে দাঁড়াবে তখনই আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এক উম্মাহ ও অভিন্ন জাতি হিসেবে প্রমাণ দিতে হবে। এরূপ একটি বিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ বিগত ২০০৮ সালে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পুরো ভারতের সকল মুসলমানদের নিয়ে একটি কনফারেন্সের ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে দল-মত-নির্বিশেষে ইসলামিক চিন্তাধারার সকলকে দাওয়াত করা হয়েছিল। তার উল্লেখযোগ্য ফলাফল আমাদের সামনে বিদ্যমান। সেই কনফারেন্সে দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুহতামীম মাওলানা মরগুবুর রহমান (রহ.)-এর প্রদত্ত ভাষণ গোটা জাতির জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ হয়ে থাকবে। উক্ত ভাষণের নির্বাচিত অংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

"আজ এই নাজুক মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বিষয়টি আগেকার সকল যুগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়ে

দাঁড়িয়েছে। অসম্ভবের কী আছে? আমরা ছোটখাটো বিষয়ের মতানৈক্যকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে শত্রুদের বিপক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি প্রমাণ করব। এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য হযরত মু'য়াবিয়া (রা.)-এর উত্তম আদর্শ নয় কি? তিনি যখন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন ঠিক সেই সময় রোম সম্রাট হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে তাঁর সাথে ঐক্যের প্রস্তাব করেছিলেন আর হযরত মু'য়াবিয়া (রা.) তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ইসলাম ধর্মে ফাটল সৃষ্টিকারী এই প্রস্তাবকারীকে 'হে রোমের কুত্তা!' বলে ঘৃণার শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি সে হযরত আলী (রা.)-এর রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করো তাহলে হযরত আলী (রা.)-এর প্রথম সৈনিকের নাম হবে 'মু'য়াবিয়া'। আজ এই কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা সময়ের দাবি। আমাদের সকলের উচিত এই দাবির প্রতি কর্ণপাত করা এবং তার আলোকে নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।" (খুতবায়ে সদারত, সন্ত্রাসবিরোধী কনফারেন্স, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ইং)

সম্মানিত উপস্থিতি! একদিকে দারুল উলূম দেওবন্দ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের এই ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা; আর অন্যদিকে "গায়রে মুকাল্লিদের" ধ্বংসাত্মক কর্মকৌশল! তারা কেবল উলামায়ে দেওবন্দ না, বরং যেকোনো ইমাম ও পূর্বসূরিদের অনুসরণকারীদের গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট প্রমাণের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

আহলে হাদীসের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার সারাংশ :

আপনি যদি গায়রে মুকাল্লিদ-আহলে হাদীসদের কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন এবং তার আলোকে তাদের চিন্তাধারা মূল্যায়ন করেন তাহলে খুবই ভয়ানক দৃশ্য আপনার সামনে ভেসে উঠবে। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই–

এক. গায়রে মুকাল্লিদরা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের বিপরীত আকিদা রাখেন। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামগণকে "হুজ্জত" বা প্রামাণ্য মনে করেন না, বরং সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুমন্তব্য করা ও অশালীন বক্তব্য রাখা তাদের উলামায়ে কেরামদের সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্য বড় বড় ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে "কোরআন-সুন্নাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা, শরীয়তের মূল পাঠের বিপরীত আমল, গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলে ভুলের শিকার, কোরআনের হুকুমে পরিবর্তন, রাগের বশীভূত হয়ে ভুল ফতোয়া প্রদান" ইত্যাদির মতো অভিযোগ উত্থাপন এবং তাঁদের শানে বেয়াদবিমূলক শব্দের প্রয়োগ তাদের কিতাবাদিতে ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হয়।

দুই. গায়রে মুকাল্লিদরা "ইজমায়ে উম্মত" তথা উম্মতের ঐকমত্যের বিপরীত আমল করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

তিন. তারা সলফে সালেহীনের তাফসীর বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোরআনের ব্যাখ্যার বিপরীত নিজেদের মনগড়া তাফসীরকে প্রাধান্য দেন।

চার. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসআলা নিয়ে কঠোরতা তাদের বিশেষ নিদর্শন। যে সকল মাসআলায় একাধিক মতামতের সুযোগ রয়েছে তন্মধ্য থেকে একটিকেই হক্ব ও অন্যান্যগুলোকে বাতিল গণ্য করাই তাদের মূল কাজ।

পাঁচ. তারা মুজতাহিদ ইমামগণ, ফকীহ মুহাদ্দিস ও আউলিয়ায়ে কেরামের সাথে বেয়াদবি করে।

ছয়. এই সম্প্রদায় নিজেদের ব্যতীত অন্য সকল দলকে গোমরাহ, বিদ'আতী বা মুশরিক মনে করে। এই সম্প্রদায়ের মতাদর্শ ও আকিদা-বিশ্বাস তাদের কিতাবাদিতে সবিস্তার উল্লেখ রয়েছে (বিস্তারিত দেখুন : জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কর্তৃক প্রকাশিত "মাজমুয়া'য়ে রসায়েল"।)

এ ছিল গায়রে মুকাল্লিদদের আকিদা-বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ থেকে যেকোনো জ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন যে এই চিন্তাধারা কোরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরি আসলাফদের আকিদা-বিশ্বাসের সাথে কতই সাংঘর্ষিক! বস্তুত সঠিক চিন্তাধারা, যার ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত ঐকমত্য পোষণ করেন তা হলো, মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় ও বিরোধপূর্ণ মাসায়েলের ক্ষেত্রে কঠোরতা করা যাবে না। যেখানেই কোরআন-সুন্নাহর আলোকে দুটি মতামতের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে কেবলমাত্র একটিকে হক্ব ও অপরটিকে বাতিল বলা যাবে না।

মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে কঠোরতা নয় :

এ বিষয়ে আকাবিরগণের অবস্থান হলো, বিরোধপূর্ণ মাসআলার ক্ষেত্রে কঠোরতা নয়, বরং অনেকটা সহজ পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ রয়েছে। তার স্পষ্ট প্রমাণ বনু কুরাইযার সেই ঐতিহাসিক ঘটনা, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই দলের কাউকেই তিরস্কার করেননি। যাদের একদল "আসরের নামায বনু কুরাইযায় পৌঁছে পড়বে"–এই নির্দেশকে এমনভাবে আমলে নিয়েছে যে পথে ওয়াক্ত শেষ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আসরের নামায আদায় করেনি। অন্যদিকে অন্য দল এর অর্থ নিল, "দ্রুত পৌঁছে যাওয়া" তাই, তখন আসরের নামায কাজা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলো তখন তারা আসরের নামায পথেই আদায় করে নিল।

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো একটি দলকে সমর্থন না জানিয়ে এ কথা প্রমাণ করলেন যে "ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা" যদি শরীয়তের কোনো একটি "নস-মূল পাঠ"-কে দুই ভাবে অনুধাবন করেন এবং এর কারণে একে অপর থেকে পরিপূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন তখন কাউকে ভর্ৎসনা করা যাবে না।

এ ঘটনার আলোকে সম্মানিত ইমামগণ ও পূর্বসূরি আসলাফদের কর্মপন্থা হলো, বিরোধপূর্ণ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন না করা। বিশেষত যে সকল বিষয়ে একাধিক মতামতের সুযোগ রয়েছে সেখানে কোনো একটি নির্দিষ্ট করে হক্ব এবং অপরটিকে চূড়ান্তভাবে বাতিল বলা যাবে না। তার প্রমাণের জন্য পূর্বেও অনেক উলামায়ে কেরামের বিশদ "ইবারত ও মূল পাঠ" উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ রেখে এখানে শুধুমাত্র আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি মূল পাঠ উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করছি।

فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ مُوَالَاةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَعُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنْ يَقْصِدَ الْحَقَّ وَيَتَّبِعَهُ حَيْثُ وَجَدَهُ، وَيَعْلَمَ أَنَّ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَمَنْ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ لِاجْتِهَادِهِ، وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ .وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَّبِعُوا إِمَامَهُمْ إِذَا فَعَلَ مَا يَسُوغُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَسَوَاءٌ رَفَعَ يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِمْ، وَلَا يُبْطِلُهَا، لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا الشَّافِعِيِّ وَلَا مَالِكٍ وَلَا أَحْمَدُ .وَلَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ دُونَ الْمَأْمُومِ، أَوْ الْمَأْمُومُ دُونَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ رَفَعَ الرَّجُلُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا يُوجِبُ اتِّبَاعَهُ، وَيُنْهَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ؛ بَلْ كُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَهُوَ وَاسِعٌ :مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ .فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ . وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ عَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ الْإِقَامَةَ شَفْعًا شَفْعًا، كَالْأَذَانِ فَمَنْ شَفَعَ الْإِقَامَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ أَفْرَدَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَوْجَبَ هَذَا دُونَ هَذَا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ

অনুবাদ : সাধারণ মুসলমানদের প্রতি ভালোবাস প্রদর্শন ও মুহাব্বতের আচরণ প্রত্যেক ঈমানদারের ওপর কর্তব্য-জরুরি। হক্ব ও বাস্তবতা যেখানেই পাওয়া যাবে, সেদিকেই মনোনিবেশ করতে হবে। জরুরি জ্ঞাতব্য বিষয় যে ইজতিহাদকারী গবেষকদের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুলের স্বীকার হলে তাঁর ভুল ক্ষমাযোগ্য ও ইজতিহাদের কারণে তিনি একটি প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন। ঈমানদাদের ওপর ইমামগণের অনুসরণ জরুরি, যদি তিনি শরীয়তসম্মত সিদ্ধান্ত দেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, انما جعل الامام ليوتم به ইমামকে অনুসরণের জন্যই ইমাম বানানো হয়েছে। সুতারাং নামাযে হাত উঠানো, বা না উঠানো কোনোটিই নামাযীর নামাযে কোনো ক্ষতি করবে না এবং নামায কোনো ইমামের নিকট বাতিল গণ্য হবে না। না ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট, না ইমাম শাফী (রহ.)-এর নিকট, না ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট, না ইমাম আহমদ (রহ.)-এর নিকট। অনুরূপভাবে যদি ইমাম হাত উঠায় আর মুক্তাদী হাত না উঠায় অথবা এর বিপরীত হয় তখনো তাদের কারো নামাযে ত্রুটি হবে না। তেমনি যদি কখনো হাত উঠায় আবার কখনো হাত না উঠায় তখনো কারো নামাযে কোনো ত্রুটি হবে না। শরীয়তে এমনটি করার অনুমতি নেই, কোনো ইমামমের মতকে চূড়ান্ত মনে করা এবং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত অন্যান্য মতামত থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করা। বরং যে সকল মতামত সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত তার সব কয়টির বৈধতার সুযোগ রয়েছে। যেমন–আযান-ইকামত সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমের হাদীসে এসেছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে আযান জোড় শব্দ দ্বারা এবং ইকামত বেজোড় শব্দ দ্বারা দিতে। আবার বুখারী-মুসলিমে এটিও প্রমাণিত যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু মাহজুরা (রা.)-কে ইকামতও আযানের ন্যায় জোড় শব্দ দ্বারা দিতে বলেছেন। অতএব যারা ইকামতে জোড় শব্দ গ্রহণ করবে তাও শুদ্ধ আবার যারা বেজোড় শব্দ গ্রহণ করবে তাও অশুদ্ধ বলা যাবে না। যে ব্যক্তি এই দুই পন্থার কোনো একটিকে ওয়াজিব এবং অপরটি বাতিল মনে করবে সে পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ। এবং যারা এই দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষকে এ কারণেই ভালোবাসে ও অন্যপক্ষকে এ কারণেই ভালোবাসে না তারা সকলেই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। (ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া-খ : ২৩ পৃ. ১৫৪)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

কাউকে অবজ্ঞা ও উপহাস করার পরিণতি

মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী
অনুবাদ : মুফতী মাহমুদ হাসান

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের একদল অন্য দলকে যেন উপহাস না করে, কেননা হতে পারে (আল্লাহর নিকট) উপহাসকৃত দল উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। অনুরূপ কোনো মহিলা যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে, কেননা হতে পারে উপহাসকৃত মহিলা উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম। (সূরা হুজরাত, আয়াত-১১)

উক্ত আয়াতে "তাসখীর"-এর অর্থ হলো, কারো অসম্মান ও তাচ্ছিল্য করা। এমনভাবে কারো দোষ বর্ণনা করা, যাতে মানুষ তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে, এতে ওই ব্যক্তির অন্তরে ব্যথা আসে। এ ধরনের কাজ অনেক রকম হতে পারে। যেমন–কারো চলাফেরা, উঠাবসা, কথাবর্তা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ করা, কারো শারীরিক গঠন ও আকার-আকৃতি নিয়ে কটূক্তি করা, তার কোনো কথা বা কাজের ওপর ঠাট্টা করা। চোখ, হাত-পা দ্বারা টিকা-টিপ্পনী মারা ইত্যাদি এ সকল জিনিস অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "দুনিয়ায় যারা কাউকে নিয়ে উপহাস করে তাদের জন্য আখিরাতে জান্নাতের দরজা খোলা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে। কিন্তু তারা যখন কাছে এসে জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে উদ্যত হবে তখনই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এভাবে বারবার তাদেরকে ডাকা হবে এবং প্রবেশ করতে গেলেই তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। একপর্যায়ে এভাবে করতে করতে সে নিরাশ হয়ে আর জান্নাতের দিকে ফিরে যাবে না। এভাবে দুনিয়ায় তার উপহাসের পরিণামে আখিরাতে তাকে নিয়ে এ ধরনের উপহাস করা হবে।

অনর্থক কথায় ইহকাল ও পরকালীন ক্ষতি :

কিছু লোক ঠাট্টা ও উপহাসকে হাস্য-রহস্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করে কাউকে উপহাস করে বসে, অথচ উভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। রসিকতা শর্ত সাপেক্ষে বৈধ, যা নবী করীম (সা.) থেকেও প্রমাণিত। শর্ত হলো, এতে যেন অসত্যের মিশ্রণ না হয় এবং কারো মনে কষ্টের কারণ না হয়। তাও সর্বদা ও অভ্যাসগত যেন না হয়, বরং কখনো কখনো হয়ে যাওয়া মন্দ নয়। কিন্তু যে উপহাস ও ঠাট্টার কারণে কারো মনে ব্যথা আসে তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এ ধরনের উপহাসকেও বৈধ রসিকতার অন্তর্ভুক্ত মনে করা মূর্খতা এবং গোনাহের কারণ। কারো উপহাস করা মুখের গোনাহের মধ্য থেকে একটি বড় গোনাহ। আমি গত মজলিসে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা বলে ছিলাম যে অনর্থক কথা, অর্থাৎ এমন কথা বলা, যা দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণকর নয় তা মানুষকে কোনো না কোনো গোনাহে নিপতিত করার উসিলা হয়ে থাকে, তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। তা শুনে কোনো কোনো সাথী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কখনো কখনো আমরা ঘরে বিবি-বাচ্চা ও মেহমানদের সাথে বিভিন্ন কথা বলে থাকি, ওই সময় কথা না বলে একদম চুপ করে থাকাটা মেহমানের হক্ব পরিপন্থী ও অসম্মান বোঝায় তখন কী করা উচিত? তো ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে অনর্থক কথা বলা এক জিনিস, যাতে দ্বীন-দুনিয়া কোনোটিরই উপকার নেই এবং এর সাথে কারো হক্বও সম্পৃক্ত নয়। অথচ আমাদের ওপর আমাদের বিবি-বাচ্চাদের হক্ব রয়েছে, তা আদায় করাও জরুরি। ইরশাদ হয়েছে, "তোমার ওপর তোমার নফসেরও একটি হক্ব রয়েছে এবং তোমার স্ত্রীরও হক্ব রয়েছে।" এখন যদি কোনো মানুষ অনর্থক কথা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে বিবি-বাচ্চাদের সাথেও কথা না বলে, তাহলে তাদের হক্ব নষ্ট হবে, তা কখনো জায়েয হবে না। অনুরূপ মেহমানের সাথে চুপ করে বসে থাকা ওই মেহমানের অধিকার হরণ হবে। মেহমানের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করা এবং তাকে খুশি করাও সাওয়াবের কাজ। আর তা একজন মুসলমানের প্রাপ্য। মেহমানের সম্মান করতে হবে। এর জন্য তার মন রক্ষার্থে তার সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। তবে হ্যাঁ, এসব কিছুরও একটি সীমা রয়েছে, সীমাতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

মেহমানের হক্ব আদায়ের সীমা :

এ কথার ওপর আমার একটি ঘটনা স্মরণ হয়েছে। তা হলো অধিকাংশ সময় কিতাবাদি মোতালাআয় ব্যস্ত থাকি,

বিশেষত যখন লাইব্রেরিতে মোতালাআর জন্য বসি, গবেষণার কাজে নিমগ্ন হই, কোনো বিষয় অন্তরে এলে কলম নিয়ে তা লিখতে উদ্যত হই; ঠিক তখনই কখনো কোনো মেহমান এসে পড়ে। সে সালাম-মুসাফাহা করে কথায় লেগে যায়। তখন এতে অন্তরে একটু বিরক্তির উদ্রেক হয় এবং বোঝা মনে হয়। এ ব্যাপারে আমাদের হযরত শায়েখকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ভাই! তুমি যে লেখালেখি ও পড়াশোনা করছ তা কি তোমার নফসের চাহিদা পূরণের জন্য করছ নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছ। যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই এগুলো করে থাকো তাহলে এ মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হচ্ছে মেহমানের সম্মান ও আপ্যায়ন করা। এটিই এ মুহূর্তের হক্ব ও অধিকার। যদিও তুমি আজকের দিনে এই কাজ সম্পাদনের শিডিউল করেছ, তবে যেহেতু এখন মেহমান এসে গেছে, কাজের ফাঁকে মেহমানকেও একটু সময় দেওয়া তার হক্ব এবং আল্লাহর হুকুম। সালাম-কালাম ও সংক্ষিপ্ত কথাই হোক। মেহমানকে ওই সময় পর্যাপ্ত সময় না দিতে পারলেও সংক্ষিপ্ত কথার পর পরবর্তীতে অন্য সময় দিতে পারো। আর যদি তোমার পড়াশোনা-লেখালেখির কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং তোমার নফসের চাহিদা পূরণার্থে হয় এবং মেহমানকে সময় দিতে কষ্ট হয়, তাহলে তা নফসের গোলামী হবে। এটি কোনো শরীয়ত নয়। যে সময় আল্লাহর যে হুকুম সে সময় তা করার নামই হলো শরীয়ত। হযরতের এ কথার দ্বারা আমার এ ব্যাপারে সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। অর্থাৎ মেহমানের সাথে প্রয়োজন অনুপাতে সালাম-কালাম ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা সময় নষ্ট হয় না, বরং তা মেহমানের হক্বের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও সন্তুষ্টির কারণ। তবে হ্যাঁ, মেহমানকেও আপনার সময় এবং কাজের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। অযথা যেন মেজবানের সময় নষ্ট না করে। অতিরিক্ত ও অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়।

কারো উপহাস করা উচিত নয় :

প্রয়োজনাতিরিক্ত কথাও অনর্থক কথার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ কথা থেকে টেনে শয়তান গোনাহের দিকে কখন যে নিয়ে যাবে তা টেরও পাওয়া যাবে না। আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ রয়েছে সিধেসাদা ও সরল প্রকৃতির। তাদেরকে নিয়ে কিছু মানুষ হাসি-তামাশা করে থাকে, সেই যেন একটা কৌতুকের বিষয় বস্তু। সে কৌতুক যদি এই পরিমাণে সীমাবদ্ধ হয় যাতে সে খুশি থাকে তাহলে তো আপত্তিকর নয়। তবে যদি কৌতুক ও ঠাট্টা এ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যা তার অন্তরে কষ্ট দেয়, তার খারাপ লাগে, তাহলে এমতাবস্থায় উক্ত কৌতুক ও রহস্য অনেক বড় গোনাহের কারণ হবে। কেননা তা বান্দার হক্বের সাথে সম্পৃক্ত। আর যে আয়াতটি আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম। সূরা হুজুরাতের আয়াত, যাতে আল্লাহ তা'আলা মুআশারাতের দিকনির্দেশনামূলক বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। ইরশাদ করেন–

لايسخر قوم من قوم

"কেউ যেন কারো উপহাস না করে।"

عسى ان يكونوا خيرا منهم

"হতে পারে যাদেরকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে তারা (আল্লাহর নিকট) তোমাদের থেকে উত্তম।" এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولا نساء من نساء

"অনুরূপ কোনো মহিলা অপর মহিলাকে তাচ্ছিল্য করবে না।"

عسى ان يكن خيرا منهن

"হতে পারে তাচ্ছিল্যকৃত মহিলা তোমাদের চেয়ে আল্লাহর নিকট উত্তম।" কোরআনে কারীমের এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে কাউকে নিয়ে উপহাস করতে শক্তভাবে নিষেধ করেছেন। এই আয়াতে মহিলাদেরকে বিশেষভাবে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও আয়াতের প্রথম অংশের দ্বারাই মহিলা-পুরুষ সকলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। তার পরও মহিলাদের ব্যাপারটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন। তবে এর দুটি হিকমত বোঝা যায়। এক. সাধারণত মহিলাদের মধ্যে এ অভ্যাসটি বেশি পরিলক্ষিত হয়, তাই তাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। দুই. যেহেতু পুরুষদের মজলিস ভিন্ন হবে এবং মহিলাদের মজলিস ভিন্ন হবে, তাই পৃথক পৃথক উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে পুরুষ-মহিলার মজলিস ও চলাফেরা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিত। আজকাল যেরূপ নারী-পুরুষের যে অবাধ মেলামেশা এ আয়াতে ইঙ্গিতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

কাউকে ঠাট্টা ও উপহাস করা কবীরা গোনাহ :

যা হোক! উক্ত আয়াতে কাউকে উপহাস করাকে সুস্পষ্ট গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিশেষভাবে এ কথাও বোঝানো হয়েছে যে তোমরা অন্যকে যে তাচ্ছিল্য করছ এর দ্বারা তোমরা নিজেকে বড় ও উত্তম ভেবেই অপরকে তাচ্ছিল্য করছ। এ তো চরম অহংকার যে নিজেকে উত্তম ভেবে অপরকে তুচ্ছ ভাবা হচ্ছে। তবে স্মরণ রেখো, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "ওই সহজ-সরল সিধেসাদা যে ব্যক্তিকে

তুমি তাচ্ছিল্য করছ, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট কতটুকু মর্যাদাশীল। কারো শুধু চেহারা দেখেই তো তুমি বলতে পারবে না যে আল্লাহ তা'আলার সাথে তার কতটুকু সম্পর্ক। প্রত্যেক বান্দার সঙ্গেই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একটি সম্পর্ক থাকে, এর মাঝে অনুপ্রবেশ করার কি অধিকার তোমার? তুমি কি জানো, সে আল্লাহর সাথে কী সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে, সে আল্লাহর কত প্রিয়? কারো শুধু বাহ্যিক অবয়ব দেখেই কোনো মন্তব্য করা যাবে না। কেননা মানুষ জানে না কার সাথে আল্লাহর সাথে আন্তরিকভাবে কতটুকু গভীর সম্পর্ক।

কাউকে জাহান্নামী বলা জায়েয নেই :

কতেক লোক কারো ব্যাপারে বলে দেয় যে সে তো জাহান্নামী, তার অমুক দোষ ইত্যাদি। নাউযুবিল্লাহ! কথাটি অনেক মারাত্মক কথা। জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালা আল্লাহ তা'আলার হাতে। কাউকে এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। বাহ্যিক কাউকে খারাপ, বদকার, ফাসেক মনে হলেও হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর পরামর্শ হলো, তার ব্যাপারে এই চিন্তা করবে যে হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তার ভেতর এমন কোনো ভালো গুণ রেখেছেন, যার বদৌলতে তার সাথে আল্লাহর সাথে এমন মজবুত সম্পর্ক হয় যার উসিলায় তোমার চেয়ে মর্যাদায় আগে বেড়ে যাবে। আজ যদিও মন্দ মনে হচ্ছে, কাল হয়তো আল্লাহর রহমতে এমন পরিবর্তন হবে যে সবাইকে পেছনে ফেলে দেবে। কাউকে দেখে নিজেকে বড় মনে করা, তার থেকে নিজেকে উত্তম মনে করা এবং ওই ব্যক্তিকে ছোট মনে করাকেই তাকাব্বুর বা অহংকার বলা হয়। অহংকার মারাত্মক ক্ষতিকর একটি জিনিস। আল্লাহ তা'আলা দয়া করে সকল মুমিনকে তা থেকে হেফাজত করুন।

গোনাহগারকে তাচ্ছিল্য করাও হারাম :

এ জন্য আল্লাহ তা'আলার উক্ত ইরশাদ ব্যাপকভাবে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য–

عسى ان يكونوا خيرا منهم

"হতে পারে ওই সব লোক তাদের থেকে উত্তম।"

বাক্যটি ব্যাপক, মুত্তাকী পরহেযগার, গোনাহগার সকলেই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ–

لا يسخر قوم من قوم

বাক্যটিও ব্যাপক অর্থবোধক। কেউ কারো উপহাস যেন না করে চাই উপহাসকারী যত বড় মুত্তাকী-পরহেযগারই হোক এবং উপহাসকৃত ব্যক্তি যত বড় ফাসেক ও গোনাহগারই হোক না কেন। হ্যাঁ, এটা জায়েয আছে যে অমুক ব্যক্তির এ কাজটি গোনাহের কাজ এবং তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে। কিন্তু গোনাহের কারণে গোনাহগার ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্য ও অপমান করা বৈধ নয়। কথাটি এভাবে বুঝতে পারো গোনাহগারকে মূলত অসুস্থ মনে করো। কেউ যদি কোনো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তার ওপর দয়ার আচরণ করা হয়। তার সাথে রাগ করা যাবে না, তাচ্ছিল্য ও অপমান করা যাবে না। তো গোনাহগার বেচারাও একজন গোনাহের রোগী। কে বলতে পারে, হয়তো আল্লাহর নিকট তার কোনো কাজ পছন্দনীয় হয়ে আছে, যার বদৌলতে তাকে মর্যাদাবান করে দেবেন। এ জন্য কখনো কাউকে তাচ্ছিল্য ও উপহাস করা যাবে না। তুমি বাহ্যিকভাবে যত বড় মুত্তাকী-পরহেযগারই হও কিন্তু হতে পারে তোমার চেয়ে ওই উপহাসকৃত ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অনেক মর্যাদাবান।

ইঙ্গিতেও কাউকে উপহাস করা বৈধ নয় :

কাউকে ইশারা-ইঙ্গিতে উপহাস করাও এর অন্তর্ভুক্ত। কারো কথাবার্তা, চালচলন বা গঠন-প্রকৃতি নিয়ে টিকা-টিপ্পনী মারা ও হাসাহাসি করা, যার কারণে সে কষ্ট পায়, তাও হারাম। এক হাদীসে এসেছে, একদা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জনৈকা স্ত্রীর ব্যাপারে আলোচনা প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে তাঁর গঠন বেঁটে হওয়ার কথা বললেন, শুধুমাত্র হাতের ইশারায় তা বলেছিলেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তাঁকে বললেন, আয়েশা! তুমি মারাত্মক ভুল করেছ। হযরত আয়েশা (রা.)-কে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন যেন কখনো কারো কোনো বিষয় নিয়ে তাচ্ছিল্য না করা হয়। যেরূপ সামনাসামনি কারো কোনো বিষয় নিয়ে এমন কথা বলা, যাতে ওই লোক কষ্ট পায়, তা তো মারাত্মক গোনাহ। সাথে সাথে উক্ত ঠাট্টা ও উপহাস যদি তার সামনে না করে তার অনুপস্থিতিতে করা হয় তাহলে তাতে দ্বিগুণ গোনাহ। উপহাস করার গোনাহ এবং গীবত করার গোনাহ।

হাসি-রহস্য ও উপহাসের মাঝে বিস্তর পার্থক্য :

কখনো কখনো বন্ধুদের মজলিসে পরস্পর হাসি-মশকরা হয়ে থাকে, যাতে এ কথা নিশ্চিত হয় যে এর দ্বারা কোনো সাথী মনে কষ্ট পায় না এবং ওই সব কথায় কেউ অপমান বোধ না করা নিশ্চিত হয় তাহলে তা বৈধ। কিন্তু যদি এই সম্ভাবনা থাকে যে এর দ্বারা কারো মনে কষ্ট আসতে পারে কিংবা কেউ

অপমান বোধ করবে তাহলে এ ধরনের হাসি-তামাশা কখনো বৈধ হবে না।

কারো উপহাস করার ভয়ংকর পরিণতি : একটি হাদীসে এসেছে, যারা অন্য কারো উপহাস করে, তারা তো এই উপহাস করে বসেই থাকে, কিন্তু তাদের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। আখিরাতে তাদের সাথেও এ ধরনের উপহাস করা হবে। জান্নাতের দরজা খুলে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে, কিন্তু তারা যখন এগিয়ে এসে দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে, অমনিই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তারা ফিরে যাবে। এরপর পুরনায় দরজা খুলে তাদেরকে ডাকা হবে, আবার যেইমাত্র তারা এগিয়ে এসে ঢুকতে যাবে তখনই দরজা পুনরায় বন্ধ করে দেওয়া হবে। এভাবেই তার সাথে বারবার উপহাস করতে থাকবে। একপর্যায়ে সে নিরাশ হয়ে আর জান্নাতের দিকে যাবে না। এই শাস্তি এই জন্যই যে তুমি দুনিয়ায় তোমার কথাবার্তায় কাউকে উপহাস করে কষ্ট দিয়েছিলে এখন দেখো এর মজা কী রূপ। এ জন্যই সাবধান হওয়া উচিত, যেকোনো কথা বলার আগে মেপেজুখে-চিন্তাভাবনা করেই তবে বলতে হবে।

রহস্য ও কৌতুকের সীমারেখা : কেউ কেউ মানুষের উপহাস করাকে সাধারণ রহস্য ও কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত মনে করে থাকে। অথচ উভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। হাসি-রহস্য হচ্ছে ওই সব কথাবার্তা, যার দ্বারা সকলের মনে প্রফুল্লতা আসে। হযরত রাসূলে করীম (সা.) থেকেও তা প্রমাণিত। তবে শর্ত হলো, এ ক্ষেত্রে কোনো মিথ্যা ও অসারতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না, কাউকে অপমান করা যাবে না। তাহলে তা বৈধ। একটি হাদীসে এসেছে, জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। এতদশ্রবণে বৃদ্ধা মহিলা কান্না আরম্ভ করল। তখন রাসূল (সা.) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আসল কথা হলো বৃদ্ধ অবস্থায় কেউই জান্নাতে যাবে না। অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের সময় আল্লাহ তা'আলা সকলকে যৌবন অবস্থা ফিরিয়ে দেবেন। তো রাসূল (সা.) ওই বৃদ্ধার সাথে রহস্য করতে গিয়ে কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন, যা বৃদ্ধা বুঝতে পারেনি। তবে রাসূল (সা.)-এর কথায় অসত্যের মিশ্রণ হয়নি এবং ওই বৃদ্ধার মনে কষ্ট বা সম্ভ্রমহানিও হয়নি। অনুরূপ একটি হাদীসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, তোমাকে আমি একটি উটের বাচ্চা দেব তখন লোকটি বলল, হুজুর! আমি তো বাহনের উট চেয়েছি, বাচ্চা দিয়ে কী কাজ হবে? রাসূল (সা.) বললেন, বাহনের উপযুক্ত বড় উটটিও তো কোনো একটি উটনীর বাচ্চা হবে। সামান্য সময়ের জন্য রাসূল (সা.) লোকটির সাথে রহস্য করলেন। কিন্তু এতে কোনো অসত্যের আশ্রয় নেওয়া হয়নি এবং কাউকে কষ্টও দেওয়া হয়নি। এসব অবশ্যই বৈধ। তবে এমন বৈধ কৌতুকও মাঝেমধ্যে হয়ে গেলে মন্দ নয়, কিন্তু নিয়মিত এতে লিপ্ত হয়ে যাওয়াও কাম্য নয়। মাঝেমধ্যে হলে ভালো। তবে অবশ্যই ধর্তব্য যে এসব কৌতুক রহস্যের মধ্য দিয়ে কোনো মিথ্যার প্রচার যেন না হয়, কারো প্রতি দোষারোপ বা গীবত না হয়। সর্বোপরি কেউ যেন কষ্ট না পায়। অন্যথায় তা মারাত্মক গোনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। সারকথা হলো, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের উঠাবসা, চলাফেরা ও কথাবার্তা লাগাতার চলতে থাকে। মুখ দিয়ে কী বের হচ্ছে এর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, এতে কি কারো মনে কষ্ট দেওয়া হয়ে যাচ্ছে কি না, তারও খবর নেই। কী হবে এর পরিণতি। পরিণতি সম্বন্ধে বেখবর হওয়া কখনো উচিত নয়। দুনিয়ার কাজকারবারে লিপ্ত হয়ে আখিরাতকে ভুলে যাওয়া অত্যন্ত বোকামি। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, দুনিয়া থেকে আমার চলে যেতে হবে, আল্লাহর সামনে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। প্রতিটি কাজ ও কথার জন্য আমার জবাবদিহি করতে হবে। অসতর্কতা ও গাফিলতিতে আমার থেকে যেন এমন কোনো কথা ও কাজ প্রকাশ না পায়, যার ফলে আখিরাতে আমার পরিণতি খারাপ হয়। এ জন্য সর্বদা অন্তরে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ রাখবে। আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। সকল প্রয়োজনীয়তা আল্লাহর কাছে চাওয়ার অভ্যাস করবে। সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জীবনাচরণ অধ্যায়ন করবে। যেমন–আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম ও নেককার ওলী-বুজুর্গদের জীবনী পড়ার দ্বারাও আখিরাতের ফিকির ও আল্লাহর স্মরণ লাভ হয়ে থাকে। যেরূপ নেককার ওলী-বুজুর্গদের সংশ্রবে থাকার দ্বারা আখিরাতের ফিকির লাভ হয়, তদ্রূপ তাদের জীবনাচরণ পড়ার দ্বারাও তা অর্জিত হয়। আল্লাহর ভালোবাসাপ্রাপ্ত বান্দাদের জীবনী-কথাবার্তা অধ্যায়নের দ্বারা অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা গভীর হয়। অন্তরে ঈমান তাজা হয়, গাফিলতি দূর হয়ে আখিরাতের ফিকির পয়দা হয়। এতে অযথা ও মন্দ কথাবার্তা-কাজকর্ম থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদের সকলকে এর তাওফীক দান করুন।

ভিন্ন চোখে কওমী মাদ্রাসা-৬

মাওলানা কাসেম শরীফ

বঙ্গে আধুনিক শিক্ষার রূপকার নবাব আবদুল লতিফ

ইংরেজদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করার আগে আমরা আরো কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রথমত, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ছিল ব্রিটিশদের এক ধরনের ষড়যন্ত্র। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে আরো বিস্তারিতভাবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার কথা এলেই স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নাম উল্লেখ করা হয়। গোটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কথাটা ঠিক আছে। স্যার সৈয়দের বিশেষ অবদানের কথা আমরা অস্বীকার করছি না, কিন্তু বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা ছিল নবাব আবদুল লতিফের। বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজদের প্রণীত শিক্ষার প্রসারে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে বাংলা থেকে নবাব আবদুল লতিফকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর উত্তর প্রদেশ থেকে স্যার সৈয়দ আহমদকে এ কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়। নবাব আবদুল লতিফের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছে বাংলাপিডিয়া। সংক্ষিপ্ত এ জীবনী থেকে তাঁর সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) উনিশ শতকের বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজসেবক। জন্ম ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে। তাঁর পিতা ফকির মাহমুদ ছিলেন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের আইনজীবী। আবদুল লতিফ কলকাতা মাদ্রাসা থেকে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন।

আবদুল লতিফ ১৮৪৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় আরবি ও ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৮৭৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। আবদুল লতিফ সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত অবস্থায় সেখানকার কৃষকদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নির্যাতন ও শোষণ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সেখানকার লোকদের ঐক্যবদ্ধ হতে ও তাদের অভিযোগের কথা সরকারকে অবহিত করতে উৎসাহ দেন। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। অবশেষে তাঁর উদ্যোগেই নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৮৬০ সালে ইংরেজ সরকার নীল কমিশন (Indigo Commission) গঠন করে।

১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিং-এর শাসনামলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হলে আবদুল লতিফ এ সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ সিভিল ও মিলিটারি সার্ভিসসমূহের পরীক্ষক, বোর্ডের সদস্য ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন গঠিত হলে তিনি এর 'জাস্টিস অব দি পিস' নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকেন। ১৮৬৫ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে আনীত একটি প্রস্তাবে মুসলিম সমাজে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিলে আবদুল লতিফ একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে ইংরেজ সরকারকে এ বিল সংশোধনের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন।

বাংলার মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আবদুল লতিফের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন যে ইংরেজি শিক্ষা বর্জন ও সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতির কারণে মুসলমান জাতি সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তিনি মুসলিমদের শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতিকল্পে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথমত, ব্রিটিশদের নতুন শাসন পদ্ধতির সুফল ভোগ করার জন্য মুসলিমদের প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়ত, উপনিবেশিক সরকারের প্রতি তাদের মধ্যে আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি করা। এভাবে মুসলিমদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষিত মুসলিমগণ সরকারের উদ্দেশ্য, শক্তি ও কৌশল বুঝতে পারলে তাদের মধ্যে উপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাসকশ্রেণির সঙ্গে যেকোনো ধরনের সংঘর্ষ পরিহার করার পক্ষপাতি ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ। তিনি মুসলিমদের পরামর্শ দেন, তারা যেন সরকারবিরোধী তৎপরতা ত্যাগ করে ও সরকারের প্রতি অনুগত থেকে রাজকৃপায় নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে সচেষ্ট হয়।

ধর্মনিষ্ঠ মুসলমাদের বিশ্বাস ছিল যে বিধর্মীদের অধীনে উপমহাদেশ মুসলিমদের জন্য 'দার-উল-হারব'। আর মুসলিমদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

মুসলিমদের এ বিশ্বাস দূর করার জন্য আবদুল লতিফ আলেমদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করেন। তাঁর আমন্ত্রণে জৌনপুরের মাওলানা কেরামত আলী ১৮৭০ সালের ৩০ নভেম্বর কলকাতার এক সভায় জোরালো কণ্ঠে বলেন যে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ 'দার-উল-হারব' নয়, বরং 'দার-উল-ইসলাম'।

আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে ফারসি ভাষায় এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল– How far would be the inculcation of European Sciences through the medium of English Language benefit Mohammedan students in the present circumstance of India and what are the most practicable means for imparting such instruction? এ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অনেক মুসলিম প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ লেখক ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন।

১৮৫৩ সালে 'কলকাতা আলিয়া মাদ্রসা'র সমস্যাদি তদন্তের জন্য সরকার এফ. হেলিডের সভাপতিত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। আবদুল লতিফ এ তদন্ত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে মাদ্রাসার যথাযথ উন্নতির জন্য দাবি জানান। তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি ও ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আবদুল লতিফ বরাবরই সরকারের কাছে মুসলিমদের জন্য ইংরেজি উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ফলে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করে সব সম্প্রদায়ের ছাত্রদের এ কলেজে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ সরকার সন্দেহ করে যে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্ররা জড়িত ছিল। এ কারণে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এফ. হেলিডে মাদ্রাসাটিকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। গভর্নর জেনারেল বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) আবদুল লতিফ ও মাদ্রাসার অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রদের রাজভক্তির যে পরিচয় পান, তাতে তিনি মনে করেন যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। ১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ সরকার আরো একবার কলকাতা মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু আবদুল লতিফের তৎপরতায় সেবারও মাদ্রাসাটি রক্ষা পায়। ১৮৭১ সালে মাদ্রাসার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হলে আবদুল লতিফ এর অবৈতনিক সচিব নির্বাচিত হন।

আবদুল লতিফ হুগলি কলেজ ও স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মোহসিন ফান্ডের টাকায় এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটি কার্যত হিন্দু ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হয়েছিল। এ সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মুসলিমদের জন্য একটি মাদ্রাসা চালু থাকলেও এর ব্যবস্থাপনায় অনেক অনিয়ম চলছিল। ছোটলাট জে.পি. গ্রান্ট-এর নির্দেশে আবদুল লতিফ মাদ্রাসা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে ১৮৬১ সালে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। মূলত এটি ছিল হুগলি মাদ্রাসা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন। এর ওপর ভিত্তি করেই হুগলি মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে আবদুল লতিফ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানান যে দাতার ইচ্ছানুযায়ী মোহসিন ফান্ডের টাকা কেবল মুসলিমদের জন্য ব্যয় করা হোক। তিনি এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে ১৮৭৩ সালে হুগলি কলেজ একটি সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মোহসিন ফান্ডের টাকা শুধু মুসলিমদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হয়।

আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ১৮৭৪ সালে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। তিনি দরিদ্র ও মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালান এবং বিত্তশালী মুসলিমদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি তহবিল সৃষ্টি করেন।

বাংলার মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রভাব বিস্তার এবং পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি' (Mohammedan Literary Society of Calcutta) গঠন ছিল আবদুল লতিফের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। তিনি মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও সমকালীন চিন্তাধারার অনুকূলে জনমত এবং শিক্ষিত মুসলিম, হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সমিতি গঠন করেন। এটি ছিল ভারতে মুসলিমদের সর্বপ্রথম সমিতি। এই সমিতির কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই ভারতে মুসলিমগণ প্রথম স্বনামে একটি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে। তা ছাড়া এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সভা, বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা হতে থাকে।

আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-১৮৯৪) সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করেন। ১৮৬৬ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ কলকাতায় আসেন এবং সাহিত্য সমিতির ষান্মাসিক সভায়

স্বদেশপ্রেম ও ভারতে জ্ঞানের উন্নতির আবশ্যকতার ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে আবদুল লতিফ 'আলীগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায়ও সহযোগিতা করেন। ধারণা করা হয় যে আবদুল লতিফের হুগলি মাদ্রাসা সম্পর্কিত প্রচার পুস্তিকা পড়েই স্যার সৈয়দ আহমদ এ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৬৭ সালে 'মিস মেরি কার্পেন্টার সমিতি' এবং আলীপুরে 'রিফরমেটরি ফর জুভেলিন অফেন্ডারস' প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৮৮২ সালে সেন্ট্রাল টেক্সটবুক বোর্ড কমিটির সদস্য ছাড়াও 'ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি', 'আলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স', 'ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'বেথুন সোসাইটি' প্রভৃতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটান। ১৮৮৪ সালে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর তিনি ১৮৮৫ সালে ভূপালে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে কর্তব্য পালনে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি বাংলার মুসলিমদের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর আর ভূপালে যাওয়া হয়নি।

আবদুল লতিফের কর্মদক্ষতা এবং শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাধি ও পদক প্রদান করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৮৬৭ সালে সরকারের কাছ থেকে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা স্বর্ণপদক' লাভ করেন। তিনি ১৮৭৭ সালে 'খানবাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নওয়াব', ১৮৮৩ সালে 'সি.আই.ই.' ও ১৮৮৭ সালে উচ্চতর সম্মানের প্রতীক 'নওয়াব বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত হন। তিনি তুর্কি সরকারের কাছ থেকে 'অর্ডার অব দি মাজেদি অব থার্ড ক্লাস' উপাধি লাভ করেন। বলা যায়, নওয়াব আবদুল লতিফ মুসলিমদের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন। আবদুল লতিফের মৃত্যু হয় ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই, কলকাতায়।

নবাব আবদুল লতিফের আদর্শিক চিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু ইউরোপীয় চিন্তাধারার ঘোরবিরোধী ছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি কখনো মুসলমানদের আরবি-ফারসি ও ধর্মীয় শিক্ষা ত্যাগ করার আহ্বান জানাননি। তিনি ধর্মীয় বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতেন। তাঁর এ অবস্থান অনেক মুসলমানের নজর কাড়ে। কিন্তু তিনি যে ব্রিটিশদের রাডারের বাইরের লোক ছিলেন না, সে বিষয়টি ধরা পড়ে তাঁর অন্য কাজে। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের 'দারুল হরব' ফতোয়ায় মুসলমানরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করে, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' প্রমাণ করার জন্য স্যার সৈয়দ, সৈয়দ আহমদ রেজা খান বেরলভি, গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও মুহাম্মদ ইসমাঈল বাটালভি যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, তিনিও একই পন্থা অবলম্বন করেন। নবাব আবদুল লতিফ ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' প্রমাণ করার জন্য কয়েকজন ধর্মীয় নেতার সমর্থন লাভ করেন। বিশেষত তিনি মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরি ও অন্যান্য কয়েকজন কথিত ধর্মীয় নেতার সমর্থন লাভ করেন। ১৮৭০ সালের ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির এক সভায় মাওলানা কেরামত আলী বক্তৃতা করেন। তিনি 'ফতোয়া' দেন যে ভারতবর্ষ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকলেও এ দেশ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম'। সুতরাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করার প্রয়োজন নেই। সভায় একই মতের সমর্থন করে মৌলভি ফজল আলী, আরব থেকে আগত শেখ আহমদ আফেন্দি, কাজি আবদুল বারি, আবদুল লতিফ, আবদুল হাকিম, আবদুর রউফ প্রমুখ বক্তারা বক্তৃতা করেন। এটি ব্রিটিশদের বিষয়ে মুসলমানদের মনোভাব পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ জন্মায়। (বিস্তারিত দেখুন : Enamul Haque, Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writing and Related Documents. dacca, 1968)

বঙ্গে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে সৈয়দ আমির আলীর ভূমিকা :

নবাব আবদুল লতিফের পাশাপাশি যাঁর নামটি বঙ্গে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে স্মরণীয়, তিনি হলেন সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮)। তিনি ১৮৪৯ সালের ৬ এপ্রিল উড়িষ্যার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শিয়া ধর্মাবলম্বী। ইরানের মেশেদ থেকে আগত এক শিয়া পরিবারের বংশধর সৈয়দ সাদাত আলীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। আমির আলীর প্রপিতামহ ১৭৩৯ সালে নাদির শাহের সৈন্যদলের সঙ্গে ইরান পরিত্যাগ করে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন এবং মোগল ও অযোধ্যার দরবারে চাকরি করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ইউনানি চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পাণ্ডিত্যের অনুরাগী। আমির আলীর জন্মের অল্প কিছুকাল পরে তাঁর পিতা বাসস্থান পরিবর্তন করে পরিবার-পরিজনসহ প্রথমে কলকাতায় আসেন এবং পরে চচুড়ায় চলে যান। সেখানে তাঁরা

আশরাফ ও অভিজাতদের মতো সংযত আরামপ্রদ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পরিবারের ঐতিহ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমির আলীকে তাঁর নিজস্ব পরিচিতি সম্পর্কে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। আমির আলী লেখাপড়া করেন ইংরেজ সরকারের অর্থানুকূল্যে। তাঁর পিতা সৈয়দ সাদত আলী তাঁর পুত্রদের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সুবিধাদি সাগ্রহে গ্রহণ করেন। তাঁর অনেক ইংরেজ বন্ধু ছিল। আমির আলীর বড় তিন ভাই প্রথমে কলকাতা মাদ্রাসা ও পরে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তাঁরা সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। আমির আলী শিগগিরই তাঁর ভাইদের শিক্ষাগত সাফল্য ও সুনামকে অতিক্রম করেন। হুগলি মাদ্রাসায় ব্রিটিশ শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুবাদে তাদের সহায়তায় ও কিছু প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি লাভের কারণে তিনি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৭ সালে স্নাতক ও ১৮৬৮ সালে ইতিহাসে সম্মানসহ এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৬৯ সালে এলএলবি ডিগ্রি নেওয়ার পর তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তাঁর এলএলবি সমাপ্ত হওয়ার পর ব্রিটেনে পড়াশোনার জন্য আমির আলী ইংরেজ সরকারের বৃত্তি লাভ করেন। লন্ডনে তাঁর প্রথমবার বসবাসের সময় (১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩) তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ব্রিটিশ নারীদের সম্পত্তি ও নাগরিক অধিকার আদায়ের জন্য সদ্য শুরু হওয়া ভোটাধিকার আন্দোলনের পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যাবলির ওপর তিনি উন্মুক্ত বক্তৃতাও দেন। ১৮৭৩ সালে লন্ডন থেকে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি ইসলামী বিধানের প্রগতিশীল ব্যাখ্যা দাঁড় করান। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান জগতের তুলনায় তিনি মধ্যযুগীয় ইসলামী সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে তিনি মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিশেষত নারীদের বিষয়ে তাঁর অবস্থান ছিল পশ্চিমাদের ধ্যান-ধারণার সদৃশ।

কলকাতায় ফিরে আসার পর আমির আলী অতি দ্রুত সুনাম অর্জন করেন। তিনি চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৭৯) থেকে কলকাতা হাইকোর্টের জজ (১৮৯০-১৯০৪) পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বিচারকের ভূমিকায় তিনি কিছু সামাজিক বিষয়ের ওপর, বিশেষ করে তিনি ইসলামের বহু বিবাহের অনুমোদনের ব্যাপারে সমালোচনা করেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর 'ক্রিটিকাল একজামিনেশন' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ব্রিটেন ও ব্রিটিশদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ জোরদার হয়েছিল লন্ডনে বারবার সফরের মাধ্যমে। সৈয়দ আমির আলী কেবল ইংরেজদের শিক্ষা-দীক্ষাই লাভ করেননি, তিনি ইউরোপীয় লাল-সাদা রঙের সুন্দরী বউও ঘরে তুলেছিলেন। লন্ডনে তিনি ১৮৮৪ সালে একেশ্বরবাদী চার্চে ইসাবেল ইডা কনস্ট্যামকে বিয়ে করেন, যিনি তাঁর বাকি ২০ বছরের কর্মজীবনে তাঁর সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করেন। ১৯০৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে চলে যান। এর পর থেকে খুব কদাচিৎ তিনি বঙ্গে এসেছেন। তাঁর দুই পুত্র ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলে লেখাপড়া করেছে। ইসলামের স্পিরিট মানুষের মধ্যে জাগ্রত করার জন্য তিনি 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম' লিখলেও পশ্চিমা ধাঁচে তিনি নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সৈয়দ আমির আলী ১৯২৮ সালের ৩ আগস্ট ইংল্যান্ডে মারা যান। সন্তানেরা তাঁর নির্দেশানুযায়ী তাঁর ব্যক্তিগত কাগজ ও নথিপত্র নষ্ট করে ফেলেন। (KK Aziz, Ameer Ali : His Life and Work, Lahore, 1968; SR Wasti, Memoirs and Other Writings of Szed Ameer Ali, and Szed Ameer Ali on Islamic History and Culture, Lahore, 1968)

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমির আলী উভয়েই বঙ্গে মুসলমানদের জন্য আধুনিক শিক্ষা প্রসারে কাজ করলেও তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। নবাব আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম শিক্ষাসহ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। অন্যদিকে আমির আলী মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসার মতো পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরে আবদুল লতিফের জোরালো আবেদনের ফলেই বাংলায় সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থারূপে দুটি পৃথক ধারার শিক্ষাব্যবস্থা সমান্তরালভাবে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃষ্ঠা-১৮)

আবদুল লতিফ, আমির আলী ছাড়াও ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৫), দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩), হেমায়েত উদ্দীন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১), সৈয়দ শামসুল হুদা (১৮৬২-১৯২২), আবদুল আজিজ (১৮৬৩-১৯২৬) প্রমুখ বঙ্গে মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দারুল উলূম দেওবন্দের পাঠ্যসূচি, শিক্ষানীতি ও আত্মসংশোধন পদ্ধতি

মাওলানা শাওকাত আলী কাসেমী বস্তভী
উস্তায : দারুল উলূম দেওবন্দ
সম্পাদক : অল ইন্ডিয়া রাবেতায়ে মাদারেসে ইসলামিয়া
ভাষান্তর : মুফতী আতীকুল্লাহ

ইসলাম ও ইলম :

ইসলাম হলো রহমতের চিরন্তন ঝর্ণাধারা। ইনসান জাতির জাগতিক ও মহাজাগতিক সফলতার চাবিকাঠি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যাতে রয়েছে জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান। ইসলামের এই চিরন্তন ঝর্ণাধারা থেকে জীবনের ফসলভূমিকে সিঞ্চিত করতে হলে ইলমে নববীর কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র ইলমই সে চাবি, যাদ্বারা ইসলামের দ্বীনি, জ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, রুহানী কল্যাণ ও সফলতা অর্জন সম্ভব। বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাসূলে করীম (সা.)-এর ওপর সর্বপ্রথম যে ওহী নাজিল হয় তার প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পড়ার হুকুম হয়েছে। এ থেকে ফুটে ওঠে ইসলামে ইলমের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব। সে প্রথম পাঁচ আয়াত হলো,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ☆ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ☆ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ☆ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ☆ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। (সূরা আলাক)

রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন,

'আমি মানবকুলের মুআল্লিম হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।' (সুনানে ইবনে মাজাহ)

ইলমের অত্যধিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে বিশ্বমানবতার পরম বন্ধু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কী জীবনে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোরআন করীমের দরসের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর মদীনা শরীফে হিজরত করার পর মসজিদে নববী স্থাপন করেন এবং সেখানে একপাশে এক ছোট্ট রুমসদৃশ্য ঘর নির্মাণ করেন, যাকে আরবিতে ছুফফা বলে। যাতে সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করে কোরআন-হাদীস, দ্বীনি ইলম ও দ্বীনি মাসায়েল অর্জন করতে পারেন। ছুফফা ইসলামী ইতিহাসের প্রথম মাদ্রাসা। এ ইলমী বাগিচার প্রস্ফুটিত ফুলেরা বিশ্বময় তাঁদের সুবাস ছড়িয়ে দিয়েছেন, জগদ্বাসীকে করেছেন ইলমে নববীর সৌরভে সুরভিত। কোরআন-হাদীসের আলো দিয়ে অন্ধকার এ পৃথিবীকে করেছেন আলোকিত।

সাহাবায়ে কেরামের উত্তম আদর্শকে পরবর্তী আইম্মায়ে কেরাম রাস্তার মশাল বানিয়ে দিয়েছেন। দ্বীনি ইলমের প্রচার-প্রসারে নিজের জীবনকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। মুসলমানরা হিন্দুস্তানে পা রাখার পরপরই তার আনাচে-কানাচে ইলমে নববীর মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক শাসনামলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার পাঠদান কার্যক্রম ও তার প্রচার-প্রসারের বিশেষ ব্যবস্থাপনা ছিল। সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের শাসনামলে খোদ দিল্লিতেই এক হাজার মাদ্রাসা ছিল। অন্যান্য শাসনামলেও দ্বীনি তা'লীমের প্রচার-প্রসারের সমান গুরুত্ব ছিল। (তারীখ দারুল উলূম দেওবন্দ খ. ১, পৃ. ৭৩)

মোগল শাসনামলে শিক্ষার প্রচার-প্রসারের বিশেষ ইন্তেজাম ছিল এবং বিভিন্ন প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। উলামায়ে কেরামের বিশেষ কদর ছিল শাহী দরবারে। রাষ্ট্রপক্ষ মাদ্রাসার জন্য জায়গা ওয়াক্ফ করেছিলেন, সাথে সাথে উলামায়ে কেরামের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা চালু রেখেছিলেন। সে প্রাচীন যুগে ইসলামী মাদারেসে যেসব বুনিয়াদী শাস্ত্রের শিক্ষাদান করা হতো তার মধ্যে নাহু-ছরফ, বালাগত, ফিকহ-উসূলে ফিকহ, মানতেক, ফালসাফা (দর্শন শাস্ত্র), ইলমে কালাম, হাদীস-উসূলে হাদীস, তাফসীর-উসূলে তাফসীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কখনো সেসব শাস্ত্রের সাথে গণিত, জ্যামিতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য, নীতিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও ফরায়েযসহ বহু জাগতিক শিক্ষাও প্রদান করা হতো। (নেসাবে তা'লীম দারুল উলূম দেওবন্দ : পৃ. ১)

উক্ত প্রাচীন নিসাবের ফসলস্বরূপ জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সরহিন্দি (রহ.) ও হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) অন্যতম। প্রাচীন শিক্ষা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত যেসব বিষয় ও শাস্ত্রের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে তাতে যুগে যুগে কিছু কিছু পরিবর্তনও হতে থাকে।

দরসে নিজামী :

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) যে সিলেবাসে শিক্ষা লাভ করেন সে সিলেবাস যৎসামান্য পরিবর্তনের সাথে সে যুগের দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহে প্রচলন ছিল। সেই প্রাচীন নেসাবে যুগে যুগে কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন সাধিত হয়, তবে তার প্রাণশক্তি ও

মৌলিকত্ব বিসর্জন দিয়ে নয় বরং তা স্বস্থানে চিরঅটুট রেখেই করা হয়। পরবর্তী যুগে এ নেসাবের নাম হয় 'দরসে নেজামী'। কেননা শাহ সাহেবের যুগের আরেক মহামনীষী ইখলাস ও তাকওয়ার মূর্তপ্রতীক মোল্লা নেজামুদ্দীন সাহালভী (রহ.) (জন্ম : ১০৮৫ হি. মৃত : ১১৬১ হি.) ফিরিঙ্গি মহল লাক্ষ্ণৌ মাদ্রাসার জন্য প্রাচীন নেসাবে কিছু পরিবর্তন করে, কিছু কিতাব বৃদ্ধি করে নতুন আঙ্গিকে তারতীব দিয়েছিলেন। নতুন সংস্কার করা এই সিলেবাসের নাম তাঁর নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। তাঁর তৈরি করা সিলেবাসে মোট এগারটি স্বতন্ত্র বিষয় স্থান পায়। প্রতিটি বিষয় ও তার আওতাভুক্ত কিতাবের নাম নিম্নে প্রদান করা হলো–

১. ইলমু ছরফ (শব্দ ও তার রূপান্তর শাস্ত্র) : মীযানুছ ছরফ, মুনশায়িব, পাঞ্জেগাঞ্জ, যুবদা, ছরফে মীর, ফুসুলে আকবরী, শাফিয়া, (মতান্তরে ইলমুছ ছিগাও ছিল)

২. ইলমুন নাহু (ব্যাকরণ শাস্ত্র) : নাহবেমীর, শরহে মিয়াতু আমেল, হিদায়াতুন নহু, কাফিয়া, শরহে মোল্লা জামী।

৩. ইলমুল বালাগত (অলংকার শাস্ত্র) : মুখতাসারুল মাআনী, মুতাওয়াল।

৪. ইলমুল মানতেক (যুক্তিবিদ্যা) : সুগরা-কুবরা, ইসাগুজী, তাহযীব, শরহে তাহযীব, কুতবী, মীর কুতবী, সুল্লামুল উলূম, মোল্লা হাসান, মীর যাহেদ রেসালা, মোল্লা জালাল।

৫. হিকমত ও ফালসাফা (দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র) : মায়বুযী শরহে হিদায়াতুল হিকমত, শরহে ছদরা, শামসে বাযেগা।

৬. রিয়াযী (অংক ও জ্যামিতি) : খোলাসাতুল হিসাব, উকলিদাস, শরহে চুগমীনি।

৭. ফিকহ : শরহে বিকায়া, হিদায়া।

৮. উসূলে ফিকহ (ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি) : নূরুল আনওয়ার, তালবীহ, মুসাল্লামুস সুবুত।

৯. ইলমুল কালাম : শরহে আকায়েদ (তাফতাযানী), শরহুল আকায়েদ (আদ-দাওয়ানী), শরহে মাওয়াকেফ।

১০. তাফসীর : জালালাইন শরীফ, বায়যাভী।

১১. হাদীস : মিশকাতুর মাসাবীহ। (হিন্দুস্তান মে ইসলামী উলূম ওয়া ফুনূন : পৃ. ৩২)

হযরত মোল্লা নেজামুদ্দীন (রহ.) কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস দ্বারা মাকুলাত ও মনকুলাতে যেমনি গভীরতা ও পরিপক্বতা অর্জন হয়, তেমনি অন্যান্য শাস্ত্রেও পূর্ণতা অর্জিত হয়। দেশের বেশির ভাগ মাদ্রাসায় ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। কারণ সে নেসাবে দ্বীনি উলূম ও ফুনূনের শিক্ষাদানের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছিল। এই সিলেবাসের শিক্ষার্থীদের কপালে সরকারি চাকরিও জুটে যেত সমসাময়িক শাস্ত্রীয় জ্ঞানের কারণে। (নেজামে তা'লীম ওয়া তারবীয়াত)

৭ মার্চ ১৮৩৫ ইংরেজিতে লর্ড ম্যাকালে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রাচ্য ভাষার জায়গায় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানবিষয়ক প্রস্তাবে পক্ষের ও বিপক্ষের ভোট সমান হলেও সভাপতি সাহেব ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে অবস্থান নেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ইংরেজি ভাষা চালু করার। এ শিক্ষা পলিসির পেছনে যে স্বার্থ লুক্কায়িত ছিল তা লর্ড ম্যাকালের ভাষায় শুনুন–

'এমন এক দল গঠন করা উচিত, যারা আমাদের ও আমাদের কোটি কোটি প্রজার মাঝে দোভাষীর কাজ করবে। যারা রক্তে-বর্ণে হিন্দুস্তানি হবে; কিন্তু ভাষায়, চিন্তা-ভাবনায় ও রুচি-অভিরুচিতে ইংরেজ হবে।' (মুসলমান কা রৌশন মুসতাকবিল, পৃ. ১৭১)

আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ লর্ড ম্যাকালের শিক্ষা পলিসি ও দুরভিসন্ধিকে সমূলে অপনোদন করার জন্য ও উন্নত তা'লীম-তারবীয়াতের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাতে এমন জামাআত তৈরি হয়, যারা রক্তে-বর্ণে হিন্দুস্তানি, ইরানি, তুর্কিস্তানি, আফগানি ইত্যাদি হতে পারে। কিন্তু চিন্তা-চেতনায়, স্বভাব-চরিত্রে, আচার-আচরণে ও আকিদা-বিশ্বাসে হিজাযী ও মোহাম্মদী হবে।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা :

যখন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আযাদী আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেল, হক্কানী উলামায়ে কেরামকে বেছে বেছে হত্যা করা হচ্ছিল, মোগল সালতানাতের শেষ প্রদীপটিও নিভে গেল, ইংরেজ বেনিয়ারা গোটা উপমহাদেশে দখলদারি পাকাপোক্ত করে ফেলেছিল, ইসলামী শান-শওকাত মাটির সাথে মিশে গেল, মুসলমানদের দ্বীন-ধর্ম, ঈমান-বিশ্বাস ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছিল, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে লাগল, পুরো মুসলিম উম্মাহ যখন সর্বগ্রাসী হতাশা ও নিরাশায় বিপর্যস্ত, নৈরাশ্য ও হীনমন্যতায় বিধ্বস্ত, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, ব্রিটিশ শিক্ষা পলিসি বাস্তবায়ন হওয়ার পথে, এ উপমহাদেশকে দ্বিতীয় স্পেন বানানো, ইসলাম ও মুসলমানকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার সকল আয়োজন পুরো হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তখনই দেওবন্দের দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো এক অবিস্মরণীয় আশার আলো। মহান আল্লাহ তা'আলা উপমহাদেশে ইসলাম ও ইসলামের শান-শওকাত ও ঐশ্বর্য-বীর্য সংরক্ষণ করার জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত নানুতভী (রহ.) ও তাঁর সাথী-সঙ্গীদের দিলে দারুল উলূম দেওবন্দের অবয়বে ইসলামের মাজবুত কিল্লা নির্মাণের ফিকর ঢেলে দিলেন। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত

ও দ্বীনি চিন্তা-চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মোৎসর্গকারী সিপাহসালার তৈরি করা, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে সংরক্ষণ, বিজাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অপনোদন, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসারের সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর ইঙ্গিতে কাসেম নানুতভী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে, মোতাবেক ১৫ মোহাররম ১২৮৩ হিজরীতে সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক বস্তিতে ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গণে একটি ডালিমগাছের ছায়ায় একান্ত

ইলহামীভাবে বর্তমান পৃথিবীর উলূমে নববীর প্রাণকেন্দ্র ঐতিহাসিক দারুল উলূম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দারুল উলূম কী ?

দারুল উলূম দেওবন্দ কোরআন-হাদীসের জ্ঞান ও দ্বীন-ধর্মের রক্ষাকবচ। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও মাকুলাত-মনকুলাতের অতন্দ্র প্রহরী। ইলম ও আমল, তা'লীম ও তারবীয়াতের অপূর্ব মিলন মোহনা। হিন্দুস্তানে দ্বীন রক্ষার প্রথম প্রচেষ্টার অপূর্ব প্রদর্শনী। হক্কানী উলামায়ে কেরামের আত্মত্যাগ-আত্মোৎসর্গ ও জোশ-জযবার অবিস্মরণীয় স্মৃতিস্তম্ভ। আকাবির হযরাতের শেষরাতের রোনাজারীর ফসল, সৃজনশীল চিন্তার ধারক, নববী আদর্শের বাহক, জীবন ও জীবনীশক্তির কেন্দ্র, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রজনন

কেন্দ্র। দারুল উলূম ইসলাম রক্ষার সেই ঐতিহাসিক কেন্দ্র, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসারে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবাসীর ধর্মীয় ও জাগতিক নেতৃত্বে, স্বভাব-চরিত্রের পরিশুদ্ধকরণে, ওয়াজ-দু'আয়, গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে, বক্তৃতা ও সাংবাদিকতার ময়দানে, দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে ও দেশ স্বাধীনতার আন্দোলনে যে ঐতিহাসিক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে, তা ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিরস্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবে।

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদী উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে এটাও ছিল যে লর্ড ম্যাকালে কর্তৃক ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে যে আদর্শবিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল তাকে সমূলে উৎপাটন করে ইসলামী শাস্ত্রীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সংরক্ষণ করে এমন এক আত্মোৎসর্গকারী সাহসী উলামার দল তৈরি করা, যারা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও উলূমে নববীর শিক্ষাদান, প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণে এবং কুফরী মতবাদমুক্ত রাষ্ট্র ও দূষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে চিরস্মরণীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। দারুল উলূমের মূল গঠনতন্ত্রে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার নিম্নোক্ত মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করা হয়–

১. কোরআন মাজীদ, তাফসীর, হাদীস, আকায়েদ ও ইলমে কালাম (ধর্মতত্ত্ব) ও তদসংশ্লিষ্ট জরুরি উলূমের সাথে সাথে ফলপ্রসূ সহায়ক শাস্ত্রসমূহের শিক্ষাদান করা এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের দ্বারে দ্বারে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া। সাথে সাথে পথপ্রদর্শন, হিদায়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দ্বীনের খিদমত করা।

২. আমাল ও আখলাকের প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে তালেবে ইলমদের জীবনে ইসলামী ভাবাদর্শ ও অনুশাসনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো।

৩. ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে ও দ্বীন-ধর্মের সংরক্ষণের মহা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলম ও যুবানকে তেজোদ্দীপ্ত করা এবং যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করা। খায়রুল কুরুন ও আসলাফের ন্যায় আখলাকী ও আমলী চিন্তা-চেতনা, জোশ-জযবা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

৪. শুধু নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয় বরং সবধরনের সরকারি প্রভাবমুক্ত থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তা-চেতনা ও ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা।

৫. দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য বিভিন্ন জায়গায় কওমী মাদ্রাসা স্থাপন করা এবং দারুল উলূমের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে পূর্ণ মিল রেখে শিক্ষা সিলেবাস :

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর সংস্কার আন্দোলনের বুনিয়াদের ওপর উপরোল্লিখিত লক্ষ্যার্জনের জন্য দারুল উলূমের ভিত্তি রাখা হয়েছে। এ কারণে তার পাঠ্যসূচিতে খালেস দ্বীনি তথা কোরআন-হাদীসের ইলমের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, সাথে সাথে তাতে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনও ঘটেছে। এটি সেই নেসাব, যা দরসে নিজামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করে দারুল উলূমের জন্য অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ১২৮৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বার সংস্কার করা হয়। ফারসী-উর্দূ নেসাবকে আরবী থেকে পৃথক করা হয় এবং আরবী নেসাবকে ছয় বছর মেয়াদি করা হয়, যাতে মেধাবী ছাত্ররা ছয় বছরে পূর্ণ করতে পারে। এরপর ১২৯০ হিজরীতে আবারো গবেষণা করে আরবী নেসাবকে আট বছর মেয়াদি করা হয়। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে এ রকম আংশিক কিছু পরিবর্তন করা হয়।

পাঠ্যসূচির ক্ষেত্রে আমাদের আকাবির হযরাতের কর্মপদ্ধতি দ্বারা এ কথা বিলকুল স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাঁরা পাঠ্যসূচি দুই মারহলায় তথা স্তরে বিভক্ত করেছেন। প্রথম মারহলা যাকে এই যুগে ফারসী ও রিয়াজী বিভাগ বলা হয় এবং বর্তমান পরিভাষা অনুযায়ী তাকে ইবতেদায়ী কিংবা প্রাইমারি

মাদ্রাসা বলা উচিত। এই স্তরের নেসাবে সে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা মানবজীবনে প্রয়োজন হয়। উর্দূ-ফারসী সাহিত্য ছাড়াও রয়েছে অংক, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি। উপরোক্ত শাস্ত্রীয় জ্ঞানের মাধ্যমে তালেবে ইলমদের
এতটুকু তা'লীম ও তারবীয়াত প্রদান করা হয় যে পড়ালেখা ছেড়ে দিলেও সমাজে সে একজন দ্বীনদার শিক্ষিত সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। যদি সে আধুনিক ও জাগতিক শিক্ষার পথ অবলম্বন করে তাহলে সে ধার্মিক হবে, ধর্মদ্রোহী হবে না। আর যদি সে উলূমে আরবীয়ার পথাবলম্বন করে তাহলে আকাবিরে দারুল উলূম বহুমাত্রিক খিদমতের জন্য যে রকম মর্দে মুজাহিদ ও পরিপক্ব আলেমের স্থানে আছেন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দ্বীনিয়াত কোর্স :

দারুল উলূম দেওবন্দে দ্বীনিয়াত বিভাগের ছয় বছর মেয়াদি নেসাব আজও চালু আছে। এই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি হলো যথা–অক্ষর
জ্ঞান, বুনিয়াদী আকায়েদ, পাটিগণিত, কোরআন নাজেরা, দ্বীনিয়াত, শব্দজ্ঞান, নামাযের প্রশিক্ষণ ও আমলী মশক, বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অংক, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, বিভিন্ন ভাষার কাওয়ায়েদ ও আকাবিরদের জীবনী ইতিহাস। (প্রকাশিত সিলেবাস, প্রাইমারি কোর্স, দেওবন্দ)

আরবী বিভাগের নেসাব :

আরবী বিভাগের জন্য আট বছর মেয়াদি পরিমার্জিত দরসে নেজামীকেই রাখা হয়েছে। এ নেসাবের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাকে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ এ পাঠ্যসূচির শিক্ষার্থীরা প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং তাদের মধ্যে গভীর গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একজন পরিশ্রমী, কর্মচঞ্চল ও সচল চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন তালেবে ইলম এই সিলেবাসকে আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে সমাপ্ত করলে তার মধ্যে এমন এক যোগ্যতা পয়দা হবে, যা দ্বারা সে ভবিষ্যতে মেহনত-মুজাহাদার ও চিন্তা-গবেষণা করে যেকোনো শাস্ত্রে পূর্ণতা ও পরিপক্বতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এ কথা স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে সেই প্রাচীন দরসে নেজামী হুবহু রেখে দেওয়া হয়নি বরং তার মৌলিকত্ব ঠিক রেখে ধাপে ধাপে আংশিক পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে অনুমোদন করা হয়। বর্তমান দারুল উলূমের যে নেসাব চালু রয়েছে তা ১৪১৫ হিজরীতে নেসাব কমিটি দ্বারা পরিমার্জিত রূপমাত্র।

আরবী বিভাগের আট বছর মেয়াদি শ্রেণিভিত্তিক :

বিষয় ও শাস্ত্র নিম্নে প্রদান করা হলো–

আরবী প্রথম বর্ষ : সীরতে রাসূল, ছরফ, নাহু, আরবী অনুশীলন, তাজভীদ, আমপারা হিফয।

আরবী দ্বিতীয় বর্ষ : নাহু, ছরফ, তামরীনে আরবী, ফিকহ, মানতেক, তাজভীদ, মশকে আমপারা ও সুন্দর হস্তাক্ষর।

আরবী তৃতীয় বর্ষ : তরজমায়ে কোরআন, হাদীস, ফিকহ, নাহু, আরবী সাহিত্য, তামরীনে আরবী, ইসলামী আখলাক, মানতেক।

আরবী চতুর্থ বর্ষ : তরজমায়ে কোরআন, হাদীস, বালাগত, উসূলে ফিকহ, মানতেক, তারীখে খেলাফতে বনী উমাইয়া, খেলাফতে আববাসিয়া, খেলাফতে তুর্কিয়া, মবাদী : ইলমে মদনিয়া, জুগরাফিয়ায়ে আলম ও জযিরাতুল আরব, তাজভীদ, পাঁচ পারার ইজারা।

আরবী পঞ্চম বর্ষ : তরজমায়ে কোরআন, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, ইলমে আদব, আকায়েদ, মানতেক (সুল্লাম) তাজভীদ, তারীখে সালাতীনে হিন্দ (সুলতান মাহমুদ গজনভী থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)

আরবী ষষ্ঠ বর্ষ : তাফসীরে জালালাইন শরীফ, ফিকহ, উসূলে তাফসীর, উসূলে ফিকহ, আকায়েদ, ফালসাফা, সীরত মুতালাআ।

আরবী সপ্তম বর্ষ : হাদীস শরীফ, উসূলে হাদীস, ফিকহ, আকায়েদ, ফরায়েয, তাজভীদ, মুতালাআ : আল-মাযাহিবুল ইসলামিয়া।

আরবী অষ্টম বর্ষ : হাদীস গ্রন্থসমূহ : বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ, ইবনে মাজাহ শরীফ, তাহাবী শরীফ, শামায়েলে তিরমিযী শরীফ, মোয়াত্তা ইমাম মালেক, মোয়াত্তা ইমাম মোহাম্মদ, তাজভীদ মশকসহ।

এটিই ছিল দারুল উলূমের আট বছর মেয়াদি আরবী বিভাগের রূপরেখা। দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীস পাস করার পর সনদ দেওয়া হয়। দাওরায়ে হাদীস পরবর্তী বিশেষ বিশেষ উচ্চতর বিভাগের সংযোজন করা হয়েছে যথা–উচ্চতর ফিকাহ ও ফাতওয়া প্রশিক্ষণ বিভাগ, উচ্চতর তাফসীর বিভাগ, সাহিত্য বিভাগ, উচ্চতর আরবী সাহিত্য বিভাগ, উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ ও খুশনবীস (সুন্দর হস্তলিপি) বিভাগ। আরো রয়েছে চার বছর কোর্সের তাহফীজুল কোরআন ও পৃথক পাঁচ বছরের দ্বীনিয়াত নিসাব। শিক্ষা
সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে এক বছর মেয়াদি কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স, দুই বছরের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ। ফারেগীনদেরকে 'ফেরাকে বাতেলা' 'মতবাদ-মতাদর্শের প্রতিরোধ ও অপনোদন পদ্ধতির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কয়েক বছর ধরে সাংবাদিকতার ওপর এক বছর মেয়াদি কোর্স চালু রয়েছে।

সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের শরয়ী দৃষ্টিকোণ :

আমাদের আকাবিরে দেওবন্দ যে সিলেবাস প্রবর্তন করে গিয়েছেন, তাতে মৌলিকভাবে দুই ধরনের ইলমকে

সন্নিবেশ করা হয়েছে। যথা : উলূমে আলিয়া তথা জরুরি ও মৌলিক বিষয়সমূহের জ্ঞান এবং উলূমে আলিয়া তথা জরুরি ইলমের সহায়ক বিষয়সমূহ। এক. সেসব জরুরি ও মৌলিক শাস্ত্রসমূহ, যার শিক্ষা প্রদান ও প্রচার-প্রসারের জন্য দারুল উলূম দেওবন্দসহ অন্য মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আর তা হলো মাত্র ছয়টি ও তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উলূম। যথা : কোরআন-হাদীস, ফিকাহ-উসূলে ফিকাহ, উসূলে তাফসীর, উসূলে হাদীস এবং তদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উলূম। এ ছাড়া আর যা পড়ানো হয় তা উপরিউক্ত বিষয়াদির সহায়ক ও হাতিয়ার, মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ :الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ :آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ.

রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, ইলম তিন প্রকার। এক. কোরআনে করীমের আয়াতসমূহের ইলম, যা মানসূখ (রহিত) হয়নি। দুই. সুন্নাত তথা হাদীসমূহের ইলম। তিন. কোরআন-হাদীস থেকে ইজতিহাদ করে বের করা আহকামের ইলম। এ ছাড়া অন্যান্য সকল ইলম অতিরিক্ত ও নিষ্প্রয়োজনীয়। (মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩৫)

এ কারণেই দারুল উলূম দেওবন্দের সিলেবাসে উপরিউক্ত তিন ইলমের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। সাথে সাথে সেসব উলূমের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়, যার মাধ্যমে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন (দ্বীনের গভীর প্রজ্ঞা) অর্জন হয়। কেননা কোরআনে ইলমে দ্বীনকে তাফাক্কুহ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

সিলেবাসে সমসাময়িক ও আধুনিক বিষয়সমূহকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি? দারুল উলূম দেওবন্দে আরবী স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে ছয় বছর মেয়াদের দ্বীনিয়াত কোর্স নামের নেসাব সমাপ্ত করতে হয়। যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কোরআনে কারীমের নাজেরা, বিভিন্ন ভাষা জ্ঞান, ধর্ম শিক্ষা, গণিত, ভূগোল, ইসলামী ইতিহাস, উর্দূ-ফারসী সাহিত্য, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরদের হিরণ্ময় জীবনী প্রভৃতি বিষয়। এ কোর্স শেষ করে যখন শিক্ষার্থীরা আরবী ও ইসলামী শিক্ষার স্তরে পৌঁছত তখন তাদেরকে খালেছ দ্বীনি বিষয়াদি ও তার সহায়ক বিষয়াদির শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু বিশেষ কিছু মহল থেকে তার সমালোচনা করা হয় এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। এটাকে পাঠ্যক্রমের দুর্বলতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরজ হলো, দারুল উলূম দেওবন্দ তার আদর্শে গড়ে ওঠা ইসলামী মাদ্রাসাসমূহের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, তার ব্যাপক প্রচার-প্রসার এবং মুসলিম উম্মাহর ধর্মীয় ও জাতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করা; বিজ্ঞানী, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা নয়।

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন, তাতে নিত্যনতুন সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোজনের প্রস্তাবনা কিংবা দাবি আজ নতুন নয়, দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রায় ছয় বছর পরে ১৮৭২ সালে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.) নিজ বয়ানে এ বিষয়ের ওপর গভীর আলোকপাত করেছিলেন এবং তিনটি চিরস্মরণীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেছিলেন,

প্রথম বাণী : সমসাময়িক শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য আগে থেকেই সরকারি মাদ্রাসা বিদ্যমান। বর্তমান প্রয়োজন দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। আর এই প্রয়োজনকে সামনে রেখে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দ্বিতীয় বাণী : দ্বীনি শিক্ষা ও সমসাময়িক আধুনিক শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সমন্বয়করণ উভয় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সমান ক্ষতি বয়ে আনবে (বাংলাদেশের সরকারি মাদ্রাসগুলোর হাল-হাকীকত কারো অজানা থাকার কথা নয়...)। না দ্বীনি ইলমে ব্যুৎপত্তি অর্জন হবে, না জাগতিক শিক্ষায়, কেননা নির্দিষ্ট সময়-কালে অত্যধিক জ্ঞানার্জন সবার জন্য যে ক্ষতিকর, তা প্রমাণিত।

তৃতীয় বাণী : উলূমে নকলিয়্যা তথা নববী শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে কোনো তালেবে ইলম সরকারি মাদ্রাসায় গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করে, তবে তার ইলমী যোগ্যতা আরো তেজোদ্দীপ্ত হবে। (বর্তমান যামানার আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বক্ষেত্রে যে পতনোন্মুখ অবস্থা বিরাজ করছে হযরত নানুতভী (রহ.) এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকলে এ অনুমতিও দিতেন না।)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোজনের যৎসামান্য যে উপকারিতা শোনা যায় তা হলো, কওমী মাদ্রাসার ফারেগ ও গ্র্যাজুয়েটদের আর্থিক সচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি। দেখা যায় বহু রাজ্যে সরকারি মাদ্রাসা বোর্ড কায়েম করা হয়েছে, দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোকে তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং জাগতিক শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার মধ্যে সমান গুরুত্বের সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, সাথে সাথে সনদপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদেরকে সরকারিভাবে বেতন-ভাতাও দেওয়া হয়। কিন্তু সেসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর কী করুণ অবস্থা, তা কারো কাছে অজানা থাকার কথা নয়। সেসব প্রতিষ্ঠান শুধু কি আপন ছন্দ-মহিমা, স্বোপার্জিত স্বজাত স্বকীয়তা ও ঐশ্বর্য-বীর্য হারিয়েছে? সাথে সাথে জ্ঞানিক, চারিত্রিক ও ব্যবস্থাপনার

স্বাধীনতা কি চরম পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়নি? সেসব প্রতিষ্ঠান কি নিরেট সরকারি স্কুলে পরিণত হয়নি? তা আজ সবার সামনে দিবালোকের ন্যায় সমোদ্ভাসিত। এ কথা এখন স্পষ্ট, স্বয়ংপ্রকাশ ও দৃঢ়মূল। এ সূর্য-সত্যকে কেউ অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিশালাকারে কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দ্বীনি মাদ্রাসার আপন ছন্দ-মহিমা, শান-শওকাত ও মহাজাগতিক ও ঊর্ধ্বলৌকিক ঐশী জ্ঞানের সাথে অটুট সম্পর্ক ধরে রাখার যুদ্ধের অগ্রসৈনিক শ্রদ্ধাভাজন উলামায়ে কেরাম, চিন্তাশীল সিপাহসালারগণ ও বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তার ক্ষতির দিকসমূহ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড, দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্মৌ, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ, দারুল উলূম ওয়াক্ফ দেওবন্দ, মুজাহেরুল উলূম সাহারানপুর, তানজিমে আবনায়ে কাদীম দারুল উলূম দেওবন্দ। এই সিদ্ধান্তকে ইসলামী মাদ্রাসাসমূহের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া, কওমী মাদ্রাসার প্রাণশক্তিকে খতম করে দেওয়া ও সব ধরনের স্বাধীনতা হরণের মতো ভয়ংকর পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ কারণেই দারুল উলূম দেওবন্দ সব সময় সরকারি সহযোগিতা গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ওপর জোর তাগিদ দিয়ে আসছে।

সমসাময়িক আধুনিক শাস্ত্রবিষয়ে আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের সিদ্ধান্ত হলো, কওমী মাদ্রাসাসমূহের আরবী স্তরের পাঠ্যসূচিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না এবং তাতে সমকালীন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোজন করা হবে না। হ্যাঁ, আরবী নেসাবের পূর্বে 'নার্সারি ও দ্বীনিয়াত কোর্স' ইত্যাদিতে সমসাময়িক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি দেওবন্দ মাদ্রাসার আদলে অন্যান্য পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষা সমাপ্তির পর ফারেগীনদের জন্য ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ চালু করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে এ কথা মনে বদ্ধমূল করে রাখতে হবে যে উলামায়ে কেরাম ইংরেজি ভাষার বিরোধিতা কখনো করেনি। হ্যাঁ, ইংরেজি তাহযীব-তমাদ্দুন ও কৃষ্টি-কালচারের জোরালো বিরোধিতা করেছেন, এখনো করেন, ভবিষ্যতেও করবেন।

কওমী মাদ্রাসায় পড়ালেখা শেষ করে আপন জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ ও তেজোদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে হযরত নানুতবী রহ.(সে যুগের পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনায়) আধুনিক কলেজ-ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। (যুগ বিবেচনায় বর্তমান বহু হক্কানী উলামায়ে কেরাম তা নিষেধ করে যাচ্ছেন) (রোয়েদাদ দারুল উলূম ১২৯০ হি. পৃ. ১১২, এজলাসে মাদারেসের সভাপতির খুতবা, ১৪১৫ হি.) কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে এই কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কওমী মাদ্রাসার ইলহামী ও ঊর্ধ্বলৌকিক ইলমে দ্বীনের এই সিলেবাসে বৃথা কাটছাঁট ও মৌলিকভাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হলে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন (ইলমে নববীর গভীর প্রজ্ঞা) ও রুসূখ ফিল ইলম (ইলমে পরিপক্কতা ও পারদর্শিতা)-এর অধিকারী কর্মতৎপর আলেমে দ্বীন, শাস্ত্রজ্ঞ মেধাবী, পরম প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, বিদগ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী ফকীহ ও প্রখর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেম সৃষ্টি হবে না। এমনিতেই এই যুগ অধঃপতনের যুগ, কর্মতৎপর মানুষ সৃষ্টি ও শক্তিশালী আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ তৎপরতা হুমকির মুখে। এই করুণ অবস্থায় যদি আকাবির ও আসলাফের আদর্শিক পথ ও রীতি-নীতিকে বিদায় জানানো হয় তবে কীর্তিময় আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আলোকিত ও জাগ্রত মনের অধিকারী চৌকস ও বিচক্ষণ হক্কানী উলামায়ে কেরামের আবির্ভাব হবে না। হযরত আকবর এলাহবাদী (রহ.) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাণহীন, লক্ষ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার যে অবস্থা নিজ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সে অবস্থার দিকে ধাবিত হবে এবং সে করুণ পরিণয় বরণ করতে হবে। কবি বলেন,

تعلیم جو دی جاتی ہے یہاں وہ کیا فقط بازاری

جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শিক্ষা যা দেওয়া হয় তা তো শুধুই বাজারি
শেখানো জ্ঞান-বুদ্ধি সবই তো হয় শুধু সরকারি

নিজামে তা'লীম (শিক্ষানীতি) :

দারুল উলূম দেওবন্দ এমন এক সর্বজনীন শিক্ষানীতি সবার সামনে সফলভাবে তুলে ধরেছে, যদ্বারা যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমে দ্বীন, মুসলিম উম্মাহর একনিষ্ঠ খাদেম এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন তৈরি হচ্ছে। সে শিক্ষানীতিতে নিম্নোক্ত মৌলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১. কওমী মাদ্রাসার নিজাম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুদানের ওপর ভিত্তি করে চলবে। সরকারি অনুদান থেকে পরিপূর্ণরূপে বিরত থাকবে, যাতে পূর্ণাঙ্গ আযাদী ও স্বাধীনতা, পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার সাথে কওমী মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কায়েম রাখা যায়। তা থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণও বিচ্যুত হওয়া যাবে না। এ বিষয়ের ওপর দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতা

মাওলানা কাসেম নানুতভী (রহ.) উসূলে হাশতগানা তথ মূলনীতি অষ্টকের ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। হযরত মাওলানা ফাজলুর রহমান উসমানী বলেন–

اسکے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کیلئے
کوئی سرمایہ بھروسے کا ذرا ہو جائے گا
پھر یہ قندیل معلق اور تعلق کا چراغ
یوں سمجھ لینا کہ بے نور و ضیاء ہو جائے گا

এর প্রতিষ্ঠাতার ওসিয়ত রয়েছে যে যখন তার জন্য স্থায়ী পুঁজির কোনো ধরনের ব্যবস্থা করা হবে তখন বুঝে নেবে এই ঝুলন্ত প্রদীপ ও আসমানী সম্পর্কের বাতি আলোহীন দীপ্তিশূন্য হয়ে যাবে।

এ মূলনীতি ও আদর্শে আদর্শিত হয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের জিম্মাদারগণ সরকারি অনুদান থেকে বিরত থাকেন এবং অন্যান্য মাদ্রাসার জিম্মাদারদেরকেও এ মানহাজ অনুকরণের আহ্বান করেন।

২. খালেস দ্বীনি পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে, যাতে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। এমন এক জামাত তৈরি হয়, যারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের হেফাজত ও তার প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ইসলামের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সংরক্ষণ ও সমাজের দ্বীনি জরুরত পূরণের মতো ফরয কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন।

৩. মাদ্রাসা সকল কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা শূরাভিত্তিক হবে। হযরত নানুতভী (রহ.)-এর উসূলে হাশতগানাহে (মূলনীতি অষ্টক) তার স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, যাতে এমন নেজাম কায়েম হয় যার সাথে প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে গভীর মিল থাকে এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে না হয়।

৪. মাদ্রাসার সকল মুদাররিসীন ও কর্মচারীকে অবশ্যই সমমনা, একই চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাসের অনুসারী হতে হবে। এমন শিক্ষাগত ও আধ্যাত্মিক যোগতাসম্পন্ন আসাতেযা নিয়োগ দেওয়া হবে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র গড়ে তোলা।

৫. উলূমে নবুওয়াতের শিক্ষার্থীদের কল্যাণকামিতা প্রাধান্য পাবে। তালেবে ইলমদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয় সামগ্রিসমূহের চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং তাদের থাকা-খাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. তালেবে ইলমদের দৈনন্দিন তা'লীমের সাথে সাথে তারবীয়াতের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের চিন্তায়-চেতনায় ও জীবনে-মননে দেওবন্দী আদর্শের বীজ রোপণ করতে হবে। তাদের বাতিল মতবাদবিষয়ক এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে তারা যেন বাতিলের বিরুদ্ধে আদর্শিক ও ইলমী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

তাদের ওপর জোর দিতে হবে, যেন তারা আকায়েদ, ইবাদত, আখলাক ও মুআমালা-মুআশারাসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের অনুশাসন ও নববী আদর্শকে পথের মশাল বানিয়ে নেয়। মানবসেবা ও খেদমতে খালকের জন্য শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা। তাদের রাত-দিনের আচার-আচরণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। অসৎ চালচলন ও আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকার তাগিদ দেওয়া একান্ত জরুরি। উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনকল্পে দারুল ইকামার (ছাত্রাবাস) ব্যবস্থাপনাকে মজবুত করা হবে।

৭. মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনাকে সমুন্নত ও দৃঢ় রাখার জন্য গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হবে এবং অবশ্যই সেই মতে চলার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হবে।

৮. ভর্তি, ভর্তি পরীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষাসমূহ গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে এবং তাকরার ও মুযাকারা তথা পারস্পরিক সবকের আলোচনার নেজামকে সচল রাখতে হবে।

৯. আসাতেযায়ে কেরাম দরসের সময় কিতাবের হল ও যোগ্যতা সৃষ্টির প্রতি পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ ও দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবেন।

১০. দরসদানকালীন সংক্ষিপ্তাকারে কিতাবী সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিতাবের কঠিন জায়গাসমূহ সমাধানদানে পূর্ণাঙ্গ মনোযোগী থাকবেন। তালেবে ইলমকে সব বিষয়ের উৎসের সাথে পরিচিত করাবেন। নিষ্প্রয়োজনীয় বহস ও আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকবেন।

১১. নির্ধারিত পাঠ্যসূচি শেষ করতে হবে। মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক নিসাব ও পড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

১২. আসাতেযায়ে কেরামের মধ্যে যার সাথে যে ফনের সম্পর্ক বেশি তাকে সে ফনের কিতাবের জিম্মাদারি দেওয়া হবে।

১৩. পরীক্ষাসমূহ অত্যধিক গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে নেওয়া হবে। দরজায়ে চাহারুম তথা আরবী স্তরের চতুর্থ বছরের আরবীর পরীক্ষাসমূহ পূর্ণ সতর্কতার সাথে নেওয়া ও সেসব জামাতের গড় উপস্থিতি বাড়ানো।

১৪. ইবতেদায়ী তা'লীম ও পঠনপাঠন, যোগ্য ও অভিজ্ঞ আসাতেযায়ে কেরামের জিম্মাদারিতে দেওয়া।

১৫. আরবী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৬. চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের অনুশীলন ও ভাষা সাহিত্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা।

১৭. শিক্ষকদের সবক এ পরিমাণ দিতে হবে, যাতে তাঁরা শিক্ষা প্রদানের জিম্মাদারি সুচারুরূপে আদায় করতে সক্ষম হন।

১৮. শিক্ষক নির্বাচনে আত্মশুদ্ধি,

খোদভীতি, ইলমী যোগ্যতা, স্বভাব-চরিত্রের মাধুর্যতা, চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষতা ও ছাত্রদের তা'লীম-তারবীয়াতে আগ্রহ, দক্ষতা প্রভৃতি গুণ আছে কি না তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

১৯. আসাতেযায়ে কেরাম উপরন্ত কিতাব মুতালাআ করে তালেবে ইলমদের মধ্যে যোগ্যতার পরিধি বিস্তৃত করবেন।

২০. আরবী ষষ্ঠ বর্ষ থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত ছাত্রদেরকে পরীক্ষাসমূহের পারচা (উত্তর পত্র) আরবী ভাষায় লেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

২১. তালেবে ইলমদের মধ্যে আরবী ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে আরবী ম্যাগাজিন ও পত্রিকার ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য দারুল মুতালাআ প্রতিষ্ঠা করা।

২২. তালেবে ইলমদের মধ্যে বক্তৃতার যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সাপ্তাহিক বক্তৃতা-সেমিনারের আয়োজন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

তারবীয়াতের (আত্মশুদ্ধি) নেজাম :

দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরগণ তা'লীমের সাথে সাথে তারবীয়াত, জ্ঞানিক যোগ্যতার সাথে সাথে আত্মশুদ্ধির ওপর খাস তাওয়াজ্জুহ ও বিশেষভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। দেওবন্দ মাদ্রাসা হলো নযরী তা'লীম (দৃষ্টিভঙ্গিগত শিক্ষা) ও আমলী তারবীয়াতের (প্রয়োগভিত্তিক শিক্ষা প্রদান) কল্পনাতীত মিলন মোহনা, যা দারুল উলূম দেওবন্দের বে-নজির, বে-মেসাল বৈশিষ্ট্য। কবি আকবর ইলাহবাদী বলেছেন–

آدمی، آدمی بناتے ہیں
کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں

কোর্স শুধু শব্দজ্ঞান দেয়
মানুষ, মানুষ বানায়

দারুল উলূম দেওবন্দ ইসলামের এ শাশ্বত বাণীকে পুরো জগতে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার করেছে যে 'তা'লীম তা'লীমের জন্য নয়, শিক্ষা শুধু শিক্ষিত হওয়ার জন্য নয় বরং তা'লীম আমলের জন্য হওয়া চাই'। দারুল উলূমের সেই আবেগ-অনুভূতি ছিল, সেই রুচি-অভিরুচি ছিল, যা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে, মানুষ গড়তে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। হযরত মাওলানা মুফতী শফী সাহেব (রহ.)-এর পিতাজি হযরত মাওলানা ইয়াসিন সাহেব (রহ.) বলতেন, আমরা দারুল উলূম দেওবন্দের সে সোনালি যুগ দেখেছি যে যুগে তাঁর চাপরাসি তথা গেটম্যান থেকে নিয়ে সিনিয়র আসাতেযায়ে কেরাম ও মুহতামিম পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি কামেল ওলী ও সাহেবে ওয়ালায়ত ছিলেন। দিনে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উলূমে নববীর চর্চা হতো; আর রাতে জিকির ও ইবাদতে মাদ্রাসার আনাচ-কানাচ আলোয় আলোয় দীপ্তিময় হয়ে উঠত। (মাজালেসে মুফতীয়ে আজম, পৃ. ৫৬০)

কবি বলেন,

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو
کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی

আত্তার কিংবা রুমী, রাজী কিংবা গাজালী কিছুই হতে পারে না কেউ শেষ রাতের আহজারী ছাড়া।

হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা. বলেন,

দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি রাখা হয়েছে ইলম ও আমলের মিলনস্থলে। তাতে যে পরিমাণে গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের জ্ঞানিক যোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দেওয়া হয় তাদের আমলী তারবীয়াতে। তাদের প্রতিটি চাল-চলনকে, ভাব-স্বভাবকে ও জীবন-মননকে আসলাফের চিন্তার ফসল দিয়ে, চেতনার উৎকর্ষতা দিয়ে, আত্মার পরিশুদ্ধতা দিয়ে, নিষ্ঠার নির্যাস দিয়ে দীপিত-উদ্দীপিত করার অবিরাম চেষ্টা চলত। দেওবন্দ উলূমে নবুয়তের এমন এক চিরন্তন ঝর্ণাধারা যেখানে হৃদয়ের ফসল ভূমিতে খোদাভীতি ও তাকওয়ার জলসিঞ্চন হতে থাকে; যেখানে ইবাদত-বন্দেগীর, আবেগ-উদ্দীপনার শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছানো হয়। দেওবন্দ ইলম ও আমলের এমন এক শক্তিশালী মিলন মোহনা, যেখানে হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, সুন্নাত-মাকরূহ ও উত্তম-অনোত্তমের শুধু তা'লীমই দেওয়া হয় না, বরং তার সাথে সাথে আমলী ফিকর, বাস্তব জীবনে তার বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও সুফল তাদের মনোজগতে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়। দেওবন্দ ইবাদত-বন্দেগী ও অনুসরণ-অনুকরণ ছাড়াও এমন এক আখলাকী ময়দান, যেখানে মুআমালা-মুআশারা , আদব-আখলাককে সুন্নাতে নববীর সাঁচে ঢালা হয়, যেখানে ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিনয়-বিনম্রতা, ধৈর্য-সহনশীলতা, অকৃত্রিমতা ও সরলতা, সত্য ও সততার গুণ সৃষ্টি করা হয়। তা ছাড়া এটা এমন এক আমলী ময়দান, যেখানে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের যোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়। যেখানে প্রত্যেক তালেবে ইলমকে এই দর্শন হৃদয়াঙ্গম করে দেওয়া হয় যে, ইলম থেকে শুধু ইলমই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য যশ-খ্যাতি, অর্থ-সম্পদ উপার্জন নয় বরং বুনিয়াদী উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের সৌরভে নিজেকে সুরভিত করে তোলা, সর্বগুণে সুসজ্জিত করে অন্যের মাঝেও সে সুবাস ছড়িয়ে দেওয়া। এ জন্য কোনো নেককার পীর-বুজুর্গের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা দেওবন্দের প্রতিটি তালেবে ইলমের জন্য আবশ্যকীয় ছিল। দেওবন্দের যত মনীষী আমাদের নজরে পড়ে তারা কোনো না কোনো শায়খের আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ পেয়ে ধন্য হয়েছেন ও তাঁদের সোহবত ও খিদমত করে সৌভাগ্যবান হয়েছেন। (হামারা তা'লিমী নেজাম, পৃ. ৯৩)

উলামায়ে দেওবন্দের বহুমুখী খিদমত :

উলামায়ে দেওবন্দ জগৎময় বহুমুখী যে খিদমত আনজাম দিয়েছেন তা

ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাঁরা ইসলাম ও মুসলমানের হেফাজত, দ্বীনি উলূমের তা'লীম, তার অবিস্মরণীয় প্রচার-প্রসার, বিশুদ্ধ মিনহাজের ওপর মুসলিম উম্মাহর অতুলনীয় খিদমত, ইসলামের শত্রু শক্তি ও অন্তঃসারশূন্য বাতেলের আস্ফালন ও তাদের আন্দোলনের মূলোৎপাটন, দ্বীনে ইলমের প্রচার-প্রসারের জন্য মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা, দেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দখলদারত্বের পাঞ্জা থেকে স্বাধীন করার আন্দোলনের নেতৃত্ব, বিভিন্ন বিষয় ও শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করে ইসলামী লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধকরণ, সাহাবায়ে কেরামের ইজ্জত-আব্রু ও আসলাফের সম্মানের হেফাজত, মুনকিরীনে হাদীস ও মুনকিরীনে খতম নবুয়তের প্রতিহতকরণ, বিদ'আত ও অপসংস্কৃতির হাত গুঁড়িয়ে দেওয়া, আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ ও সমাজ সংস্কারের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা, দ্বীনি দাওয়াতে তাবলীগের অগ্রসৈনিক, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ, মিল্লাতে ইসলামীর ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় ও চিরবরণীয় যে খিদমত ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে ইতিহাসের কপালে যে নকশা অঙ্কুরিত করেছেন তা বিশ্বময় আলো ছড়াতে থাকবে এবং বিশ্বমানবতার জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। দারুল উলূম দেওবন্দের এই বহুমাত্রিক খিদমত যেসব মহামনীষী দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। তাঁরা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য গর্বের ছিলেন, এত অল্প সময়ে এমন বিশ্ববিখ্যাত, বে-নজির ব্যক্তিত্ব আর কোনো প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি হয়নি।

আমরা কিছু আকাবেরে দেওবন্দে পবিত্র নাম এখানে উল্লেখ করব, যাঁরা একেকজন চন্দ্র-সূর্যতুল্য।

হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.), মুহাদ্দেসে জলীল মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী, নানুতভী (রহ.)-এর স্থলাভিষিক্ত মাওলানা মোহাম্মদ আহমাদ সাহেব (রহ.), হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রহ.), শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মদনী (রহ.), মুতাকাল্লিমে ইসলাম মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী (রহ.), শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ইযায আলী (রহ.), ইমামে দাওয়াত ও তাবলীগ মাওলানা ইলিয়াস কান্দলভী (রহ.), জামেউল মাকুল আল্লাম মোহাম্মদ ইবরাহীম বলয়াভী (রহ.), হযরত মাওলানা ফাখরুল হাসান (রহ.), হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহ.), মুহাদ্দেসে কাবীর যফর আহমদ উসমানী (রহ.), ফকীহুল আসর মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী (রহ.), ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী (রহ.), শায়খুল হাদীস মাওলান ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী, মাওলানা মুরতজা হাসান সাহেব (রহ.), মাওলানা বাদর আলম মীরটী (রহ.), মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী (রহ.), মাওলানা সৈয়দ ইউসুফ বিননূরী (রহ.), মাওলানা মানাযের হাসান গিলানী (রহ.) মাওলানা আহমাদ আলী লাহুরী (রহ.), মাওলানা সাঈদ দেহলভী (রহ.), মাওলানা খাইর মুহাম্মদ জালন্দরী (রহ.), মাওলানা হিফজুর রহমান (রহ.), মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মিঞা (রহ.), মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী (রহ.), মাওলানা জামিল আহমদ থানভী (রহ.), মাওলানা আব্দুল হক সাহেব (রহ.), মাওলানা মান্জুর আহমদ নোমানী (রহ.), মাওলানা কারী তৈয়ব সাহেব (রহ.), মাওলানা যাকারিয়া (রহ.), মাওলানা মাসিহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.), মুফাককিরে ইসলাম মাওলানা আবুল হাসান আলী মিয়া (রহ.), ফেদায়ে মিল্লত, মাওলানা আসআদ মদনী (রহ.), মাওলানা মিন্নতুল্লাহ (রহ.), মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান (রহ.), মাওলানা ইউসুফ লুদয়ানভী (রহ.), মাওলানা মেরাজুল হক (রহ.), মাওলানা কাজী মুজাহিদুল ইসলাম (রহ.), মাওলানা যয়নুল আবেদীন (রহ.) প্রমুখ।

শিক্ষা সিলেবাস : কিছু প্রস্তাবনা

দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা সিলেবাস, শিক্ষানীতি ও আত্মসংশোধন পদ্ধতির ব্যাপক ক্রিয়াশীলতা ও ইনসানে কামেল তথা পূর্ণ মানব গঠনে তার অকল্পনীয় সফলতার প্রমাণে উপরিউক্ত যুগশ্রেষ্ঠ মহামনীষীদের নামোল্লেখই যথেষ্ট। ফল দিয়ে যেমন গাছের কার্যকারিতা বোঝা যায়, তেমনি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও কোনো নেসাবের সুশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা সে প্রতিষ্ঠানের কর্মচঞ্চলতা ও প্রাণচাঞ্চল্যতা এবং সে নেসাব ও নেজামের সফলতাও খুব ভালোভাবে বোঝা যায়। এ কারণেই এই সিলেবাসে বুনিয়াদী কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই। কেননা নেসাবের দ্বীনি ও ইসলামী বিষয়সমূহই নেসাবের প্রাণ। তাতে কমিয়ে দেওয়া কিংবা দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা এক প্রাণবন্ত নেসাবকে প্রাণহীন করে দেওয়া এবং কওমী মাদ্রাসাসমূহকে তার আপন বুনিয়াদী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার নামান্তর। তবে হ্যাঁ, নেসাব থেকে চাহিদানুযায়ী মৌল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে কি না? তার পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই করা এবং শিক্ষা সিলেবাসকে লক্ষ্যার্জনের জন্য আরো কার্যকর ও অধিক ক্রিয়াশীল বানানোর জন্য চিন্তা-গবেষণা ও আলোচনা-সমালোচনা চালু রাখা একান্ত জরুরি। এই শিক্ষা সিলেবাসকে বেশি বেশি কল্যাণময় ও মঙ্গলজনক করার জন্য ও মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে মিল

রেখে আংশিক কিছু পরিবর্তন-পরিমার্জন করার চিন্তা-ফিকর চালু রাখা উচিত। এরই ধারাবাহিকতায় দারুল উলূম দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে ১৪১৫ হিজরীতে 'কুল হিন্দ তানযীমে রাবেতায়ে মাদারেসে ইসলামিয়া'-এর প্রতিষ্ঠা থেকে এই পর্যন্ত সিলেবাস, শিক্ষাব্যবস্থা : কওমী মাদারেস শীর্ষক বহু সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কিছু কার্যকর পরিবর্তনও করা হয়েছে। অনেকে সে বিষয়ে নিজ গ্রন্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়েছেন, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মাও. সৈয়দ সালমান নদভী সাহেবের রচিত মূল্যবান গ্রন্থ 'হামারা নেসাব কিয়া হো'?। তিনি আপন গ্রন্থে অনেক মূল্যবান ও কার্যকর প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। যদিও সে বিষয়ে কারো কারো দ্বিমতও থাকতে পারে। মাওলানা সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের বিস্তারিত নেসাব উল্লেখ করে বলেন,

'প্রত্যেক নতুন আবিষ্কারে মাথা ঝুঁকিয়ে দেওয়া ও রটে যাওয়া কিছু মহামনীষীদের নাম জপতে থাকা যাদের ইনসানে কামেল ও যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার মধ্যে বহু উপকরণ ক্রিয়াশীল, না কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব হবে? না কোনো সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ চিন্তা-গবেষণার পরিচায়ক হবে।'

মাওলানা সাহেবের এই মন্তব্য মাওলানা সাহেবের উন্নত ও মার্জিত চিন্তা-চেতনার সাথে খুব একটা মানানসই হচ্ছে বলে মনে হয় না। যেসব বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর নাম উল্লেখ করা হয় তাঁদের পূর্ণ মানব হিসেবে গড়ে ওঠার মধ্যে অনেক বিষয় ক্রিয়াশীল তা সেসব বিষয় ছাড়া আর কী হতে পারে, যার ওপর এতক্ষণ ধরে আলোকপাত করা হচ্ছে। যা দারুল উলূম দেওবন্দের নেসাবে তা'লীম ও নেজামে তা'লীম ও তারবীয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত মাওলানা আব্দুল হাই হাসনী সাহেব (রহ.) নিজ কলিজার টুকরা হযরত মাওলান আব্দুল 'উলা সাহেবকে দারুল উলূম দেওবন্দে তা'লীমের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তিনিও দেওবন্দের আকাবির আসাতেযায়ে কেরাম থেকে বরকত ও ফুয়ুজাত অর্জন করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুফাক্কিরে ইসলাম আল্লামা মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)ও দারুল উলূম দেওবন্দ তাশরীফ এনেছিলেন এবং শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মদনী (রহ.)-এর বোখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফের দরসে অংশগ্রহণ করে ইলমী ও রুহানী বরকত লাভে ধন্য হয়েছেন। সবার জানারই কথা যে মাওলানা নদভীর (রহ.)-এর ব্যক্তিত্বের বিশালত্ব, সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা, তাঁর গভীর বিচক্ষণতা, দ্বীনি গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ, তাঁর ইলমী রসুখ ও জ্ঞানিক পরিপক্বতা ও দুনিয়াবিমুখিতাসহ আরো যেসব পূর্ণাঙ্গতা ও বৈশিষ্ট্য ছিল, তার মধ্যে বংশীয় আভিজাত্যতা, মহিমান্বিত পিতা, বড় ভাই হযরত মাও. ডা. আব্দুল উলা সাহেব (রহ.)-এর বিশেষ তারবীয়াতসহ নাদওয়াতুল উলামার ইলমী পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়াদি যেমনি ভূমিকা পালন করেছে, ঠিক তেমনি দারুল উলূম দেওবন্দের ইলমী, দ্বীনি ও রুহানী পরিবেশসহ হযরত শায়খুল ইসলাম (রহ.) ও হযরত মাও. আহমদ আলী (রহ.) প্রমুখ আকাবিরের নেক নজর ও নেক দু'আও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

কিছু সুপারিশ :

১. আরবী নেসাব শুরু করার পূর্বে প্রত্যেক মাদ্রাসায় যেন দ্বীনিয়াত ও প্রাইমারি কোর্স আবশ্যকীয় করা হয় এবং তার সাথে সাথে ফাইভ পর্যন্ত প্রাইমারি নেসাব থাকে। প্রাইমারিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয়।

২. প্রত্যেক মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে যত বেশি সম্ভব মক্তব-ফোরকানিয়া প্রতিষ্ঠা করা হোক।

৩. যেসব কওমী মাদ্রাসা দারুল উলূম দেওবন্দের মানহাজের ওপরে আছে তারা যেন দারুল উলূমের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি বাস্তবায়ন করেন এবং উপরিউল্লিখিত নেজামে তা'লীম ও তারবীয়াতের আলোকে নিজেদের নেজাম কায়েম করবেন।

৪. বহু মাদ্রাসায় আরবী ভাষার অনুশীলনের প্রতি তেমন কোনো মনোযোগ সাধারণত দেওয়া হয় না। ইবতেদায়ী বর্ষসমূহে আরবী তা'লীম, বলা ও লেখনীর ওপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে, যাতে আরবী চর্চার আগ্রহ-উদ্দীপনা পয়দা হয়।

৫. ফেরকায়ে বাতেলার প্রতিযোগিতামূলক মুতালাআ ও বাতেল ফেরকার বিভিন্ন ভ্রষ্ট মতবাদের যুবানী ও কলমী প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৬. সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বই ও কিতাবকে নতুন আঙ্গিকে ছাপানো হোক এবং বিভিন্ন শিরোনাম লাগানো হোক, সাথে সাথে লেখনীনীতি শাস্ত্রের অনুকরণ করা হোক।

৭. নাহু, ছরফ ও বালাগত (অলংকার শাস্ত্র) ইত্যাদির সহজীকরণ, কাওয়ায়েদের বেশি বেশি ইজারা ও তাতবীকের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা ।

৮. প্রবন্ধসহ বিভিন্ন লেখনী ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে তালেবে ইলমদেরকে দিকনির্দেশনা দেওয়া হোক এবং তাদের মধ্যে ইলমী, আদবী ও দাওয়াতী যাওক-শাওক ও আবেগ-উদ্দীপনা পয়দা করা হোক। ইসলাম, মুসলমান ও কওমী মাদারেসের সম্মুখে যুগের চ্যালেঞ্জ ও ফিতনা ও তার মোকাবিলার পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হোক।

সূত্র:http://www.darululoom-deoband.com/urdu/articles/tmp/1423461450%2003-Darul%20Uloom%20Ka%20Nisab%20Talim_MDU_06_June_2007.htm

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ শোয়াইব আরনাউত আর নেই

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস, কিংবদন্তি হাদীস বিশারদ, হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ভাষ্যকার শায়েখ শোয়াইব আল আরনাউত গত ২৭-১০-২০১৬ ইং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শায়খ শোয়াইব আরনাউত দামেস্ক শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুহাররাম আল আরনাউত। বংশসূত্রে তিনি আলবানীয়। ১৯২৬ সালে তাঁর পিতা দামেস্কে হিজরত করেন। পিতা ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার। সব সময় আলেম-উলামাদের সান্নিধ্যে থাকা পছন্দ করতেন। আলেমদের সাহচার্য লাভের উদ্দেশ্যে দামেস্কে তাঁর পিতা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সে হিসেবে হযরত শোয়াইব আল আরনাউত অত্যন্ত দ্বীনি এবং শিক্ষিত পরিবেশেই বেড়ে ওঠেন।

মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে শৈশবেই তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং অধিকাংশ কোরআন হিফজ করেন।

তাঁর মাঝে কোরআনের অর্থ ও তাফসীর বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি হলে অল্প বয়সেই তিনি আরবী ভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১০ বছর বয়সে তিনি দামেস্কের বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসায় আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রের দরসগুলোতে অংশগ্রহণ শুরু করেন। দামেস্কে তাঁর আরবী ভাষার শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন

শায়খ সালেহ ফুরফুর ও শায়খ আরেফ দাওজী। তাঁরা উভয়েই মহান ব্যক্তিত্ব বদরুদ্দীন হোসায়নীর ছাত্র এবং তৎকালীন শামের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। এই দুজন উস্তাদের কাছে তিনি শরহে ইবনে আকিল, কাফিয়া ইবনে হাজেব, যমখশরির মুফাস্সাল, ইবনে হিশামের শুযুরুযযাহাব, জুরজানির আসরারুল বালাগাহ, দালাইলুল ই'জায ইত্যাদি কিতাব অধ্যয়নের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এরপর তিনি ইলমে ফিকহ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তাঁর অধ্যয়নকৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ফিকহের কিতাব শরম্বুলালির মারাকিল ফালাহ, মাওসিলির আল ইখতিয়ার, কুদুরীর আল কিতাব, হাশিয়া ইবনে আবিদিন ইত্যাদি। লাগাতার তিনি সাত বছর ফিকহ অধ্যয়ন করেন। এর মধ্যে তিনি উসূলে ফিকহ, তাফসীর, মুসতালাহে হাদীস, ইত্যাদি শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন।

এসব ইলম অর্জনে তিনি ব্যাপক সহযোগিতা পান শেখ সোলাইমান গাউজী আল-আলবানীর কাছ থেকেও।

ফিকহ অধ্যয়নকালে হাদীসের সহীহ-যঈফ চেনার ক্ষেত্রে সমযুগীয়দের বিভিন্ন দুর্বলতা তাঁর চোখে ধরা পড়লে তিনি ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হন।

হাদীস শাস্ত্রে প্রায় তিন শত খণ্ড কিতাবের হাশিয়া, তাহকীক ও তা'লিক যুক্ত করেছেন তিনি, যা প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে।

শায়খ আল আরনাউত হানাফী মাযহাবের ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দীর্ঘ অবদানে হানাফী মাযহাবের অসংখ্য হাদীস তাহকীক ও তাখরীজে সমৃদ্ধ হয়েছে। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এ ব্যাপক অবদান মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তাঁকে অতি উচ্চাসনে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি অনেকে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর এসব খেদমাত বিশেষ করে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের জন্য বড়ই মাথাব্যথার কারণ ছিল। তাদেরই বড় মুহাদ্দিস শায়খ আলবানী সাহেব শায়খ আরনাউতকে গোড়াপন্থী, মাযহাবী এবং আপন মাযহাবের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী বলে বিভিন্ন সমালোচনা করতেন। শায়খ আরনাউতও আলনাবী সাহেবের বিভিন্ন তাহকীকের ওপর পর্যালোচনা করতেন। তবে তাঁর ভাষা হতো অত্যন্ত পরিমার্জিত-পরিশীলিত। জনাব আলবানী সাহেবের চিন্তাধারা, হাদীসের তাহকীকে বিভিন্ন গরমিল ইত্যাদি নিয়ে শায়খ আরনাউতের কিছু কিছু লেখাও পাওয়া যায়।

শায়খ আরনাউতের ব্যাপক এবং সেরা খেদমাতের মধ্যে একটি হলো তাঁর হাতে লেখাপড়া শিখে বড় বড় অনেক মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈরি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে–মুহাম্মদ ইবরাহীম যীবক, আদেল মুরশিদ, উমর হাসান আল কুয়্যাম, আহমদ আব্দুল্লাহ, আব্দুল লতীফ হিরজুল্লাহ, রিদওয়ান আরকসূসী, মুহাম্মদ আবু নাঈম আরকসূসী প্রমুখ।

আরেকটি সেরা খেদমাত হলো হাদীস গ্রন্থের তাহকীক। তাঁর তাহকীক ছিল খুবই গ্রহণযোগ্য এবং সহীহ। যার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে আলবানী সাহেবসহ আহলে হাদীসদের বিভিন্ন সমালোচনা এবং অভিযোগ ধোপে টেকেনি।

শায়খ শোয়াইব আরনাউতের তাহকীককৃত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাব হলো–শরহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী ১৬ খণ্ড, রওজাতুল তালিবিন লিন নাবাবী ১২ খণ্ড, মুহায্যাবুল আগানী লি ইবন মানযূর ১২ খণ্ড, আলমাবদা ফী শরহিল মুকনা' ১০ খণ্ড, যাদুল মুয়াস্সার ৯ খণ্ড, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা [জাহাবী] ২৫ খণ্ড, সুনানুত তিরমিযী ১৬ খণ্ড, সুনানুন নাসাঈ ১২ খণ্ড, সুনানু দারা কুতনী ৫ খণ্ড, মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৫০ খণ্ড, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী, আত্তালীকুল মুমাজ্জাদ, তবকাতুল কুররা, শরহে আকীদাত্তাহাবী, মারাসীলে আবী দাউদ, রিয়াজুসসালেহীন, মাওয়ারিদুয যামআন বি-যাওয়ায়েদি সহীহে ইবনে হিব্বানসহ আরো বহু কিতাব।

ইন্তেকালের পরের দিন তাঁর জানাযা হয় এবং স্থানীয় কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়।

শোক প্রকাশ :

তাঁর ইন্তেকালে মাসিক আল-আবরারের প্রধান সম্পাদক ও ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরার মহাপরিচালক মুফতী আরশাদ রহমানী এক শোক বার্তায় বলেন, এই মহামনীষীর বিয়োগে মুসলিম উম্মাহের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। তিনি যে মহান এবং অবিস্মরণীয় খিদমাত রেখে গেছেন চিরকাল মুসলমানগণ তা থেকে উপকৃত হতে থাকবে এবং তাঁর রুহে সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তিনি তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন এবং ভক্ত-অনুরক্তদের সবরের তাওফীক দানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : ইমামতি

মুহা. আলমগীর হোসাইন
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।

জিজ্ঞাসা :

এক মসজিদের ইমাম সাহেব স্কুলে কিংবা কলেজে শিক্ষকতা করেন। সেখানে তিনি ছেলে ও মেয়েদের যৌথ ক্লাসে পাঠদান করান, আবার অন্য মহিলা শিক্ষিকাদের সাথেও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কথাবার্তা বলে থাকেন। তা ছাড়া স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকতা করতে গেলে কতটুকু পর্দা রক্ষা করা সম্ভব হয় তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন জানার বিষয় হলো–(১) যে সমস্ত আলেম স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকতা করে তাদের ইমামতি করা সহীহ কি না? (২) এ ধরনের ইমামের পেছনে নামায পড়লে নামাযের হুকুম কী হবে? (৩) মসজিদ কমিটির এ ব্যাপারে দায়িত্ব কী?

সমাধান :

পর্দা ইসলামের একটি ফরয বিধান। স্কুল বা কলেজে যে ব্যক্তি বেপর্দাভাবে মেয়েদেরকে পাঠদান করে তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরিমী। এতদসত্ত্বেও তার পেছনে নামায পড়লে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে মসজিদ কমিটির দায়িত্ব হলো, প্রশ্নোক্ত ইমাম তাওবা করে উক্ত কাজ থেকে বিরত না হলে তাকে অপসারণ করে খোদাভীরু ও দ্বীনদার যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া। (আদ্দুররুল মুখতার-১/৫৫৯, রদ্দুল মুহতার-১/৫৬০, আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৩১৯)

প্রসঙ্গ : জানাযা

মাওলানা জালাল উদ্দিন
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

জানাযা নামাযের পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

শরীয়তের আলোকে জানাযার নামাযই প্রকৃত দু'আ। জানাযার নামাযের শেষে দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে পুনরায় দু'আ করার বিধান শরীয়তে নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সম্মিলিত দু'আ শরীয়তসম্মত না হওয়ায় তা বর্জনীয়, তবে দাফনের পর দু'আ করা যাবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/২২৫, মেরকাতুল মাফাতীহ-৪/১৪৯, আল মুহিতুল বুরহানী-৩/১০৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাওলানা আব্দুল হাফিজ
টেকনাফ, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

১। মসজিদের বারান্দায় নূরানী মক্তব পড়ানোর বিধান কী?

২। মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমিকে মাদ্রাসার ওয়াক্‌ফকৃত জমির সাথে বদল করা যাবে কি না?

৩। মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে বিল আদায়পূর্বক অন্য স্থানে লাইন নেওয়া যাবে কি না?

উল্লেখ্য, উক্ত সব কাজ মোতাওয়াল্লির অনুমতি সাপেক্ষে করা হবে।

সমাধান :

১। মসজিদের বারান্দা সাধারণত মসজিদেরই অংশ হয়ে থাকে। তাই বারান্দাকে স্থায়ীভাবে মক্তব বানানো যাবে না। তবে আলাদা মক্তবের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে মসজিদের আদব-ইহতিরাম বজায় রেখে শিশুদেরকে কোরআনের তা'লীম দেওয়া জায়েয হবে। (আদ্দুররুল মুখতার-১/৬৫৬, কেফায়াতুল মুফতী-১/১৬৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৫৬)

২। প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ বা মাদ্রাসার ওয়াক্‌ফকৃত জমি দ্বারা যেকোনোভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব হলে একটিকে অপরটির দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না। তবে উভয় জমির ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফের সময় পরিবর্তনের অনুমতি দিয়ে থাকলে পরিবর্তন করা যাবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী-৪/৩৮৪,)

৩। বিল আদায়পূর্বক মসজিদের বিদ্যুৎ থেকে অন্য স্থলে লাইন নেওয়া সরকারি আইনে নিষেধ না হলে মোতাওয়াল্লির অনুমতি সাপেক্ষে তা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামিয়া-৪/৪১৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১/৭৯৫)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাওলানা আব্দুল হাফিজ
টেকনাফ, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

১। মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করে মসজিদের কল্যাণার্থে ভাড়া দেওয়া যাবে কি না?

২। মসজিদের জমিতে যদি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ করে ফেলে তাহলে এখন করণীয় কী?

৩। মসজিদের জমি ভাড়া নিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাতে অস্থায়ীভাবে ঘর নির্মাণ করতে পারবে কি না?

বি.দ্র. : উল্লিখিত কাজসমূহ মোতাওয়াল্লির অনুমতি সাপেক্ষে হবে।

সমাধান :

১। মসজিদের উন্নয়নকল্পে মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে দোকানঘর ইত্যাদি নির্মাণ করে বৈধ কাজের জন্য ভাড়া দেওয়া যাবে। (আ-পকে মাসায়েল আওর উন্‌কা হল-৩/২৫৬)

২। প্রশ্নোক্ত অবস্থায় মসজিদ কমিটি ভবনটি মসজিদের নামে ক্রয় করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে ভাড়া দিতে পারবে। ক্রয় করার সামর্থ্য না থাকলে জায়গার ভাড়া নেবে। যেকোনো সময় মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে তা ভেঙে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে। (আদ্দুররুল মুখতার-৪/৪৩৩, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৬/৯৫)

৩। প্রশ্নোক্ত সুরতটি জায়েয আছে। তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দেওয়াই আসল নিয়ম। যাতে প্রয়োজনের সময় ঘর প্রত্যাহার করতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। (আদ্দুররুল মুখতার-৪/৪৩৩, রদ্দুল মুহতার-৪/৩৪৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-১৩/৩৮৬)

প্রসঙ্গ : নামায

মুহা. সালাহ উদ্দিন
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

এক ব্যক্তি রুকু-সিজদাসহ নামাযের সব রুকন ঠিকভাবে আদায় করতে পারে শুধু নামাযের সুরতে বসতে পারে না। ওই ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে?

সমাধান :

এমন মা'যূর ব্যক্তি, যে নামাযের সুরতে বসতে পারে না সে যথানিয়মে রুকু-সিজদা আদায় করে যেকোনো সুরতে বসতে পারবে। (বোখারী শরীফ-১/১৪২, আল-বাহরুর রায়েক-২/২০১, বাদায়েউস সানায়ে-২/৯২)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মোছা. নাহিদা সুলতানা (রিমু)
কলেজ রোড, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমার স্বামীর সাথে আমার তিন বছর যাবৎ সম্পর্ক। বিষয়টি আমার বাসায় জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর আমার বড় ভাই আমাকে শারীরিকভাবে ভীষণ নির্যাতন করেন। যার ফলে আমি বাসা ছেড়ে চলে আসি এবং আমার স্বামীর সাথে কোর্ট ম্যারেজ করি এবং ওদের বাসায় চলে আসি। ওর পরিবার আমাদের মেনে নেয়। আমার বাবা আমার শ্বশুরকে অনুরোধ করেন যে ওরা কী করেছে আমরা দেখিনি। তাই আপনি ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ওদের বিয়ে দেন। তখন আমার শ্বশুর তাঁর আত্মীয়স্বজনদের ডেকে এনে ওই দিনই এলাকার বড় মসজিদের ইমাম সাহেবের মাধ্যমে আমাদের বিয়ে পড়ান। বিয়েতে ওর বাবা, মা এবং ওর বড় চাচা ওর সাক্ষী হিসেবে ছিলেন এবং আমার বাবা-মা উপস্থিত না থাকায় আমার উকিল বাবা বানিয়ে আমাদের বিয়ে পড়ানো হয়। বিয়েতে এলাকার চেয়ারম্যান, থানার ওসিসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমার বাবার প্রশ্ন, মা-বাবার অনুপস্থিতিতে আমার বিয়েটা জায়েয হয়েছে কি না? অতএব মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন–আমার বিয়েটা শরীয়তসম্মতভাবে কবুল হয়েছে কি না–তা জানানোর বিনীত আবেদন রইল।

সমাধান :

শরীয়তের আলোকে মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিবাহের ব্যাপারে মেয়ে নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পিতা-মাতার ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাতে পারিবারিক জীবন বরকতময় ও সুখের হয়। এর বিপরীতে বিবাহের পূর্বে বেগানা পুরুষেরে সাথে সম্পর্ক রাখা বা দেখাশোনা করে বিয়ে ঠিক করা গোনাহ। তা সত্ত্বেও প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে কারো সাথে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে উপযুক্ত দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য পিতা-মাতার উপস্থিতি জরুরি নয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনানুসারে ইমাম সাহেবের মাধ্যমে এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিবাহ করায় আপনাদের বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে বিধায় আপনার স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে শরয়ী কোনো আপত্তি নেই। তবে বিবাহ-পূর্ব সম্পর্কের কারণে উভয়কে তাওবা করতে হবে। (তীরমিযী শরীফ-১/২১০, আদ্দুররুল মুখতার-১/১৮৫, হেদায়া-২/৩০৫)

প্রসঙ্গ : খোদা শব্দের ব্যবহার

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক

জিজ্ঞাসা :

একজন আলেমের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তা'আলাকে "খোদা" শব্দ দিয়ে ডাকার দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায় না। তাই উক্ত শব্দ দিয়ে ডাকা উচিত নয়। তিনি যুক্তি হিসেবে বলেন "খোদা" শব্দটি আল্লাহর ৯৯ নামের মধ্যে নেই এবং তা কোনো নামের তরজমাও না। অতএব মুফতী সাহেবের কাছে উক্ত বক্তব্যের বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চাই।

সমাধান :

আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম নিরানব্বইয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। "খোদা" নামটি ফারসি শব্দ, যা নিরানব্বই নামের একটি নামের মর্মার্থ। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মাঝে "খোদা" শব্দটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাই "খোদা" বলে ডাকলেও সাওয়াব হবে। অতএব এ ব্যাপারে

বিভ্রান্তি ছড়ানোর অবকাশ নেই। (সূরা আ'রাফ-১৮০, সূরা বনী ইসরাঈল-১১০, মুসনাদে আহমদ মওসুআ-৩৮১৬)

প্রসঙ্গ : সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার বিধান

মাও. সালাহ উদ্দীন
বাংলাবাজার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার পূর্বে শুধু اعوذ باللـه السميع ـالخ অথবা بسم الله ـ ও اعوذ بالله ـالخ الـخ উভয়টি পড়তে দেখা যায়। জানার বিষয় হলো উল্লিখিত উভয় পদ্ধতিই কি বৈধ? যদি বৈধ হয় তাহলে কোনটি উত্তম? শরঈ দলিল এবং আকাবিরে দ্বীনের আমলের উদ্ধৃতি দ্বারা জবাব প্রদানে আপনার মর্জি হয়।

সমাধান :

সূরা হাশরের শেষ আয়াত প্রসঙ্গে হাদীস শরিফে যে ফজীলত এবং পড়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তা হলো اعوذ باللـه السميع العليم من الشيطان الرجيم তিনবার পড়ার পর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়া। সুতরাং হাদীসে যেভাবে পড়তে বলা হয়েছে সেভাবে বেশ-কম না করে পড়াই সমীচীন, তবে যদি কেউ বিসমিল্লাহ পড়ে তাহলে সে হাদীসে বর্ণিত ফজীলত হতে বঞ্চিত হবে বলা যাবে না। (তিরমিযী শরীফ-৫/২৭, মুসনাদে আহমদ-৫/২৬)

প্রসঙ্গ : মাসিক

মুহা : মিযানুর রহমান
মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

মুছা. আয়েশা আক্তার তার হায়েজ শুরু হওয়ার এক দিন আগে অথবা এক দিন পরে ওষুধ অথবা ইনজেকশন দ্বারা হায়েজ বন্ধ করে ফেলে। এমতাবস্থায় আয়েশার ওপর শরীয়তের হুকুম কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

সমাধান :

বিনা প্রয়োজনে ওষুধ বা ইনজেকশন দ্বারা হায়েজ বন্ধ করা উচিত নয়। কেননা তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তবে কেউ যদি ওষুধ বা ইনজেকশন দ্বারা হায়েজ শুরু হওয়ার আগেই বন্ধ করে দেয় তাহলে রক্ত আসা পর্যন্ত তাকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তার ওপর শরীয়ত কর্তৃক সকল করণীয়-বর্জনীয় হুকুম-আহকাম আরোপিত হবে। আর যদি হায়েজ শুরু হওয়ার এক দিন পর বন্ধ করে এবং কমপক্ষে পনের দিনের মাঝে আবার শুরু না হয় তাহলে উক্ত দিনসমূহেও তাকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। আর যদি পনের দিনের ভেতরে আবার শুরু হয়ে যায় তাহলে মহিলার হায়েজের নির্দিষ্ট সময় তাকে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করে তাকে ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করতে হবে এবং বর্জনীয় কাজ থেকে বিরত না থাকার কারণে মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার-১/২৮৪, কিতাবুন নাওয়াযেল-৩/১৮)

প্রসঙ্গ : ওয়াক্ফ

মুহা : আযীযুর রহমান
হিজলা, বরিশাল।

জিজ্ঞাসা :

ক. মসজিদ বা মাদ্রাসার ওয়াক্ফকৃত জমিনে মসজিদ বা মাদ্রাসার সাথে সংশ্লিষ্টদের কবর দেওয়া বা গণকবরস্থান বানানো যাবে কি না? খ. এ ধরনের ওয়াক্ফকৃত জমিন ক্রয় করে কবর দেওয়া বা কবরস্থান বানানো যাবে কি না? গ. অথবা কমিটি বা শুরা এর অনুমতি সাপেক্ষে কবর দেওয়া বা কবরস্থান বানানো যাবে কি না?

সমাধান :

(ক, খ, গ) মসজিদ বা মাদ্রাসার নামে ওয়াক্ফকৃত জমিনে ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফকারীর পক্ষ থেকে কবর দেওয়ার বা গণকবরস্থান বানানোর অনুমতিসংক্রান্ত কোনো কথা না থাকলে বা পরিবর্তনের কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে সেখানে কাউকে কবর দেওয়া বা গণকবরস্থান বানানোর বা কবর দেওয়ার জন্য ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে না। এমনকি কমিটি বা শুরার সিদ্ধান্ত সাপেক্ষেও বৈধ হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার-৪/৪৩৩, ফতওয়ায়ে শামী-৪/৩৫২, আল বাহরুর রায়েক-৫/৪২৭)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মুহা : ইয়াসিন
শামবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মহল্লার মসজিদের খাদেম সাহেব দীর্ঘ কয়েক দিন যাবৎ মসজিদের তৃতীয় তলা শ্রমিকদের কাছে ভাড়া দেন তারা সেখানে রাত্রিযাপন করে এবং নির্ধারিত ভাড়াও আদায় করে। এতে মসজিদের ইমাম সাহেব মোতাওয়াল্লি ও কমিটিবৃন্দ তাঁকে এ ব্যাপারে নিষেধও করেন না। এখন আমার জানার বিষয় হলো, খাদেম সাহেবের উক্ত কাজ বৈধ হচ্ছে কি না? এবং ইমাম সাহেব মোতাওয়াল্লি ও কমিটিবৃন্দ তাঁকে উক্ত কাজ থেকে বারণ না করার কারণে গোনাহগার হবেন কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

মসজিদের ওপর ও নিচতলা সবই মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাদেম সাহেবের জন্য মসজিদের তৃতীয় তলা শ্রমিকদের রাত্রিযাপনের জন্য ভাড়া দেওয়া জায়েয নয় বরং মারাত্মক গোনাহ। জেনেশুনে তাঁকে এই সুযোগ করে দিয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট সকলে গোনাহগার হবে। (মুসলিম শরীফ-১/৫১, মিরকাতুল মাফাতিহ-৯/৩২৩, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩২১)